রাণীর বাজার

সমরেশ বসু

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

রাণীর বাজার। নাম যার নেই ইতিহাসে।

কোন ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি যে-নগরীকে নিয়ে, কিংবা কোন নাগর নাগরীকে ঘিরে। কোন দুর্জয় চেঙ্গিস কিংবা খোঁড়া তৈমুর যে মাটি কাঁপিয়ে যায় নি তাদের দস্যু পদ ভরে, অশ্ববাহিনীর ঝটিকাগতি ও অসির ঝনঝনায়, হত্যা ধর্ষণ ও লুটের উল্লাস ও আর্তনাদে যার বাতাস কখনো শিউরে ওঠেনি, আকাশে আঁকা হয়নি ইতিহাসের গৌরব-তিলক, এ সেই রাণীর বাজার। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসের কোথাও যদি, সত্যি যদি কোথাও কোন এক কোণে রাণীর বাজারের নাম চোখে পড়ে থাকে, তবে জানবে, সে শুধুই ভৌগোলিক সীমারেখা বোঝাবার জন্যে। নিতান্তই ভৌগোলিক সীমারেখা।

ভূ-চিত্রের স্কেলের, এক ইঞ্চি যেখানে চল্লিশ মাইলের সর্পিল পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে, তারই কোন এক কোণে একটি কালো কিংবা লাল ফুটকি চোখে না পড়ার মত অনেক ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকবে বড় বড় হরফে লেখা অনেক নগর বন্দরের ভিড়ে। হয়তো খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা থাকবে 'রাণীর বাজার', যা চালসে না-পড়া চোখেও ধরা পড়ার মত নয়। আকাশের অনেক নাম করা নক্ষত্রের ভিড়ে যেমন অগুনতিরা চিক্‌চিক্ করে, ঠিক তেমনি একটি সূক্ষ্ম অভ্রকুচির মত, শুধুই মাত্র জেলার অনেকগুলি থানার প্রতীক চিহ্নের একটি বিন্দু। যে বিন্দুটিকে লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে গঙ্গা নদী কোন জনপদের বুক ভাসিয়ে সাগর সঙ্গমে মিলেছে, কোন রেলওয়ের কোন লাইন কোন কোন নগর ও গ্রামের বুক পিষে সন্ধানী সাপের মত চলে গেছে সুদূরে।

কারণ রেল লাইন ও গঙ্গার জলের ঝাপটা-খাওয়া ও লৌহাবর্তের কঠিন সীমানার মধ্যবর্তী এক ছোট ভূমিখণ্ড কোন এক কাল থেকে রাণীর বাজার নাম বহন করে আসছে।

কিন্তু রাজা শশাঙ্কের কিংবা নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কোন সেনাবাহিনী রাণীর বাজারের ধুলি উড়িয়ে যায়নি, যাতে ইতিহাসের পাতায় তার নাম একবারের জন্যেও উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন রাজা-বাদশা-জর্জ-লর্ডের পদার্পণ কখনো হয়নি যে, কোন ফাঁক দিয়ে নামটা একবার এক মুহূর্তের জন্য ইতিহাসের সন্ধানী আলোকে পারে ঝলকে উঠতে। বাংলার যে অজস্র জনপদ চৈতন্যের চরণস্পর্শে ব্যাকুল ও উদ্বেল হয়েছে, তাঁর ছায়াও কোনদিন পড়েনি রাণীর বাজারে। তা হলেও হয়তো বা শ্যেনচক্ষু কোনও চৈতন্যচরিতকারের সঙ্গীত-মুখর ভাষায় একবার রাণীর বাজারের নাম মহা অলৌকিক পুরুষের চির-চরণাশ্রিত হয়ে থাকতে পারত। পুরাণের কোনো ঐতিহ্য নিয়ে, কোথাও এক টুকরো পাথরও যদি পড়ে থাকত, আর তার পাষাণ গায়ে যদি দুটি পায়ের মত দাগ পড়ত, বা কোন চিহ্ন থাকত মুদগর—ধনুকের, তা হলেও, নেতা ধোপানীর পাট বলে, কাব্যের নায়িকা বেহুলার দক্ষিণ যাত্রার পথে কোথাও রাণীর বাজারের নাম একবার দেখা যেত, কিংবা 'পুরাণ-বর্ণিত এই সেই দেশ' ভেবেও প্রাচীনের মহিমা পেতে পারত।

কিন্তু সে সব কিছুই নেই রাণীর বাজারের। তাই আর্কিওলজি বিভাগের টনক কখনো নড়েনি রাণীর বাজারকে নিয়ে। ইতিহাসবেত্তার মাথা কোনদিন ব্যথা করে না রাণীর বাজারের জন্য।

না, কোন ঐতিহাসিক পাঠানের কাম-লালসা এখানে পাষাণে মাথা কুটে মরেনি। কোন রাজপুতানী ঝাঁপ দিয়ে মরেনি চিতায়। কোন পৃথ্বীরাজ কখনো সংযুক্তা হরণ করে রাজ্য ছারখার করে, প্রেমের বেদীতে আত্মবলিদান দেননি রাণীর বাজারে। তা হলেও, জগদ্‌বিখ্যাত কোন প্রেমের ইতিহাসে রাণীর বাজারের নাম চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকত। লালসার প্রতিবাদে চিরপবিত্র ঘৃণার শুদ্ধিতে এক তীর্থক্ষেত্র নামে রাণীর বাজার ইতিহাসের পাতায় থাকত চিরমুদ্রিত হয়ে নিদেন কোন ঐতি-হাসিক রজকিনীর লাঞ্ছনায় কোন সাধক যদি এখানে 'সবার উপরে মানুষ সত্য' বাণী গেয়ে উঠতে পারত কিংবা কোন রাণী লছমীর বাসনা

শুভ্র প্রেমের শতদল ফোটাতে পারত কোন কবি, তাহলে, রাণীর বাজারের নাম ব্রজবুলি বা পদাবলীর কোন পোকায় কাটা পুঁথিতে থাকত লেখা।

এই সেই রাণীর বাজার। ইতিহাসে যার নাম নেই শুধু নয়, ইতিবৃত্ত রচিত হওয়ার কোন যোগ্যতাই যার নেই।

কোন সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক ভাঙাগড়া, যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও ঘৃণা, লালসা ও পবিত্রতা, পাপ ও পুণ্য, লোভ ও মহানুভবতা, অধর্ম ও ত্যাগ রাণীর বাজারে ঘটেনি। আধুনিকতম ইতিহাস রচয়িতার খুঁটিয়ে দেখা চোখেও রাণীর বাজারের কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি।

তাই রাণীর বাজারে যদি কেউ কখনো আসে, তবে সে আমারই মত দেখতে পাবে ছোট এক মফঃস্বল শহর, চৌহদ্দি যার এই গোটা মহকুমায় সংক্ষিপ্ততম। যদি কেউ আসে, (এখনো যারা আসেনি) তবে তারা জেনে রেখো, কোন আবিষ্কারের কষ্ট স্বীকার করে কোন দুর্লঙ্ঘ্য পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে না। বহুদূরের কোন এক অজানা দেশের সন্ধানে পাড়ি দিয়ে, নিশ্চিত-অনিশ্চিতের আশা-নিরাশায় দোলা খেতে হবে না তাকে। রাজধানী থেকে খুব বেশি দূরে নয়, খুব বেশি কাছেও নয়, এই রাণীর বাজারে আসতে বার দুয়েক মোটর বাস বদলাতে হতে পারে। রেলগাড়িতে না বদলেও আসা সম্ভব। চোখ বুজে থাকলেও, রাণীর বাজারের নির্ঘাত পথ হারাবার কোন ভয় নেই। কেন না, পথ গ্রাম্য নয়, কোন এক অতীতকালে ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত গ্রাম কিংবা নগর নয় রাণীর বাজার। সুতরাং ভুতুড়ে অরণ্য ও বর্ষার জলে বেড়ে ওঠা মানুষ-সমান আগাছার মাঝখান দিয়ে, দিনের বেলাতেও অন্ধকার সরু সুড়ংয়ের মত পথ দিয়ে, প্রাগৈতিহাসিক ভয়-ভয় কোন চেতনা নিয়ে, কেবলি পথের জটায় জড়িয়ে মরার কোন সম্ভাবনা নেই।

পথ সোজা, কতগুলি বাঁক থাকতে পারে। কিন্তু প্রশস্ত পরিষ্কার।

যদি কেউ আসে তবে তাকে আসতে হবে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই। কিন্তু তারপর তাকে থামতে হবে। কারণ

যে প্রশস্ত পথে সে এসেছে, রাণীর বাজারের সীমানায় পড়ে পথের আর সেই ঢালাও রাজকীয়তা নেই। এবার হারিয়ে যাবার ভয় প্রতি পদে পদে। হয়তো তাকে, আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে, 'অমুক পাড়ায় যাবার রাস্তাটা কোন্ দিকে, বলতে পারেন?'

আগেই বলে রাখা ভাল, আমি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাব প্রশ্নকর্তার দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখব তার আপাদমস্তক। অনুমান করার চেষ্টা করব, কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা রাণীর বাজারে এসেছে। যদিও আমার ভদ্রতায় বাধবে সেকথা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে, তবু অমুক পাড়ায় কার বাড়িতে সে যেতে চায়, সেটা জিজ্ঞেস করতে আমি ছাড়ব না।

কেন? কারণ, রাণীর বাজারের বিচিত্র অপরূপ রূপ আমি নিয়ত দেখছি, তাই। সেখান থেকে রাণীর বাজারের কোন রূপান্তর গোপন থাকেনি।

রাণীর বাজারের জংশন স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকি, প্রতিক্ষণে, সকালে-দুপুরে-বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাত্রে-মধ্যরাত্রে। কখনো সজ্ঞানে থাকি, কখনো নিশির টানে। কিন্তু না থেকে আমি কখনো পারিনি।

এইখানে, রাণীর বাজারের হাল-আমলের সদর দেউড়ি এই জংশন স্টেশনের সামনে, যত রাজ্যের যাওয়া-আসার পথের ধারে, যত চেনা-অচেনার ভিড়ে। এখন এইখান দিয়েই রাণীর বাজারে নতুন মানুষেরা আসে, পুরনো মানুষেরা যায়। এখান থেকেই দেখা যায় রাণীর বাজারের যত অন্দর ও অন্ধকারের ঘটনা। প্রকাশ্যে যা ঘটে, কিংবা ঘটনার পর প্রকাশ পায়, অতীত ও বর্তমানের সব কিছুই আছড়ে এসে পড়ে এখানে, এই সদর দেউড়ির চত্বরে। যেখানে জনতা হাততালি দেবার জন্যে, নিষ্ঠুর হেসে উপহাস করার জন্যে সর্বদাই ভিড় করে আছে প্রস্তুত হয়ে। যেখানে লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবিধান করবার জন্যে, অন্যায়ের প্রতিবাদ আর কারুর দুঃখে কাঁদবার জন্যে ছড়িয়ে আছে।

এইখান থেকেই শোনা যায়, রাণীর বাজারের স্ফুট-অস্ফুট যত কলকাকলী। যত হাসি-কান্না-গান, ক্রুদ্ধ হুংকার, ষড়যন্ত্রের ফিস-ফিসানি, হত্যার যন্ত্রণা, দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার আর সম্পূর্ণ চুম্বনের নিঃশব্দ ঝংকার।

যদি কোন সন্দেহে প্রশ্ন ওঠে, 'শোনা যায় কেমন করে?' তবে প্রশ্নকর্তাকে আসতে হবে এখানে, যেখানে আজ আমি ছায়াহীন অদৃশ্য আত্মার মত বন্দী হয়ে আছি। আমার সেই সর্বোচ্চ চিলেকোঠায়।

চিলেকোঠা-ই। ইঁট নয়, পাথর নয়, তবু রাণীর বাজার যেন এক অদৃশ্য পাঁচিলের ঘেরাও-য়ে আবদ্ধ হয়ে আছে। আর সদর দেউড়িতে আমার অবস্থানটি যেন এক সুউচ্চ চিলেকোঠা। যেখানে আছে অজস্র ঘুলঘুলি।

এই চিলেকোঠাখানি কোন এক কালে ছিল আমার খেলাঘর। এর অগুনতি ঘুলঘুলিতে আমি সকৌতুক অস্থির চোখ নিয়ে ছুটে বেড়াতাম। এখনও বেড়াই। কেন না রাণীর বাজারের সকল খেলার সঙ্গে আমার সকল দেখাদেখির খেলা এখন একাকার হয়ে গেছে। এখন না দেখিয়ে আর আমাকে রেহাই দেবে না রাণীর বাজার। কারণ রাণীর বাজারেরও ভয়ংকর আর সুন্দর বাঁধন আছে যে-বাঁধন মহামায়ার পাশের মত।

কৌতুকে হেসে খেলা দেখতে দেখতে যে-দিন ভয়ে ও ঘৃণায় শিউরে উঠেছিলাম, পালাতে চেয়েছিলাম সেইদিন। পালাতে গিয়ে দেখলাম, কার দুটি হাত আমাকে জড়িয়ে রেখেছে ধরে। ফিরে দেখলাম, ভালবাসা। উন্মুক্ত পীন পয়োধরে যার বাসনার উত্তাল-সমুদ্র ঢেউ আবর্তিত, ঠোঁটে যার পতঙ্গের ঝাঁপ খেয়ে পড়ার ঘূর্ণি আকর্ষণের আগুন, চোখের আবেশে যার রক্ত-রংমহলের খোলা দরজায় এক বিচিত্র অন্ধকারের ইশারা। দেখলাম, রাণীর বাজারের মুক্তিহীন সর্বনাশী প্রেমের দুই বাহুর ভুজঙ্গে আমি বাঁধা।

অপরিমেয় ঘৃণা ও দুর্জয় ভালবাসার এই ভয়ংকর কয়েদখানায় আটকা পড়েছি আমি। আমি রাণীর বাজারকে দেখছি।

যে রাণীর বাজারের নাম ইতিহাসে নেই কিন্তু ইতিহাস যার আছে। যার আছে পতন ও উত্থান। সংঘর্ষ-দ্বেষ-জিঘাংসা, পীড়ন-লুণ্ঠন-হত্যা, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, বীর্য-বিদ্যা-মহানুভবতা, রাণীর বাজারের ইতিহাসের স্তরে স্তরে আছে। আছে অনেক রোমাঞ্চ, রক্ত নিয়ে অনেক নিষ্ঠুর লীলারঙ্গ।

কিন্তু এই চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, দূর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৃষ্টি চালনা করে যেটা আমার চোখে আজো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, সেটা হল কোন যুগের কোন রাণীকে ঘিরে রাণীর বাজার নাম হয়েছে। কে সেই রাণী,। কোন এক কালে যে এই ভূমিখণ্ড শাসন করেছিল।

শুধু রাণী, রাজার নাম করে না যে দেশের লোকেরা। জানা যায় না, সে-রাণীর কোন রাজা ছিল কিনা। রাজাহীন এ রাজ্যের পথে পথে কি শুধু কোন এক রাণীরই ধীর-চরণ গতি নূপুর নিক্কণ বেজেছে? কে সেই রাণী, এদেশের প্রজারা গুণমুগ্ধ বংশধরদের মত যে নারীর চরণ বন্দনা করেছে? যে রাণীকে সর্বক্ষণ স্মরণের জন্য, আদর করে তারা তাদের দেশের নাম দিয়েছে রাণীর বাজার?

এ প্রশ্নের জবাবে উচ্চকিত হয়ে ওঠে শতকণ্ঠ, 'তবে শোন বলি।'

'তবে শোন বলি' বলে রকমারি কণ্ঠের রকমারি কাহিনী শুনে বোঝা যায়, কোন এক কালের সেই রাণী এখন অনেক কিংবদন্তীর রহস্যে ঘেরা বিচিত্রময়ী এক যাদুকরী নারী! রূপের তুলনা যার ছিল না, গুণে তার জুড়ি মেলা ছিল ভার।

কিন্তু পরিচয় তার নানান রকম, রাণীর বাজারের অধিবাসীরা তার নাম নিয়ে টানাটানি করে। সবাই নিজের বংশ ও গোত্রভুক্ত করে, রাণীর নিকটতম ঘনিষ্ঠতমের গৌরব করে।

কিন্তু যে রাণীর কোন সঠিক কাল নেই, সময়ের সংক্ষিপ্ত বাঁধাধরার মধ্যে উত্থান ও পতন নেই, মহাকালের রথচক্র যার গায়ে জরা ও বার্ধক্যের অঙ্কন লিখতে পারেনি, এ রাণী তেমনি এক নারী, সুরসভার অনির্বাণ যৌবনবতী উর্বশীর মত, মৃত্যু যার কোন কালে হয় না।

চিরদিন ধরে যে, 'কোন এক কালে ছিল', কালের ধ্বনিতে সে চিরদিন রাজে ও বাজে।

আমি সেই রাণীর বাজারকে দেখছি।

রাণীর বাজার যেন সত্যি এক অদৃশ্য পাঁচিলে ঘেরা, ছন্নছাড়া আদ্যিকালের নগরী। সবই তার পুরনো, প্রায় প্রাচীনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, তাবৎ বাসাড়ে-বাসিন্দে-অধিবাসী, মন্দির বিগ্রহ ধর্মশালা, সবই। সরু সরু রাস্তাগুলিতে পীচ ঢেলেও তাকে কিছুতেই যেন আধুনিক করা যায় না। পুরোনো বাড়িগুলিকে কলি ফিরিয়েও তার প্রাচীন বর্ণ ও গন্ধ যায় না দূর করা। যত চওড়া নর্দমা, তত চওড়া রাস্তার কোণে কোণে, কেওরা পাড়ার শুয়োরেরা আজো বংশপরম্পরায় জটলা করে। মনে হয়, সেই একই ষাঁড়ের বংশধরেরা নগরপিতার ভূমিকায় সৃষ্টিরক্ষা করে ফিরছে অলিতে-গলিতে মাঠে-ঘাটে। তে-রাস্তার মোড়ে সেই পুরোনো বটের ঝুরি এখনো স্বাধীনভাবেই নামে। ঠাকুর ত্রিনাথ সেখানে আছেন অচল হয়ে। চলে যাওয়া দূরের কথা, আলস্যে তিনি পাশও ফেরেন না। দৈনিক গঙ্গাজলও পরবে দুধ খেয়ে খেয়ে, দেহ তাঁর ভার। কোন এক কালে হয়তো নগরবাসীর পাপে, রুদ্র হয়ে, চলে যাবার ভয় দেখিয়ে পুণ্যাত্মাকে স্বপ্নে দেখা দিতেন। এখন উঠে গিয়ে আর স্বপ্নেও দেখা দিয়ে আসতে পারেন না। কবে, কোন এক কালে, বলাই দেকে স্বপ্নে একটি গর্মীর ওষুধ দান করেছিলেন, সেই তাঁর শেষ দান রাণীর বাজারকে। বলাই দে'র বংশধরেরা 'ঠাকুর ত্রিনাথের স্বপ্নাদ্য মাদুলি' দান করে প্রতিদানে খড়ের চালায় পাকা ছাদ তুলে, রাণীর বাজারের অনেক উত্থান ও পতনের শরিক হয়েছে।

অগুন্তি গলির ভিড়ে রাণীর বাজার যেন মাকড়সার মত জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অচেনাদের হারিয়ে যাবার ভয় প্রতি পদে পদে। বুঝি শিকার সন্ধানের ফাঁদ ছড়ানো রয়েছে জাল বিস্তার করে। বুকচাপা শ্বাপদ সহস্র বাহু বুঝি কোথায় রয়েছে ওত পেতে।

কানা নয়, তবু মনে হয় চাপা অন্ধকার সুড়ংয়ের মত সব। গলিই বুঝি বাঁকের মুখে কানা হয়ে গেছে। গলিগুলিও যেন কোন এক কাল থেকেই আছে। পুরনো এবড়োখেবড়ো গলি। বাড়িগুলি তার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। বড় বড় চকমিলান উঁচু পাঁচিল, পলেস্তারা খসানো বাড়ি, একতলা দোতলা কিংবা টালিখোলা-খড় ছাওয়া নীচুতলায়, সবখানেই পুরনো পুরনো ছাপ।

গলি আর বাড়ি। গলিতে গলিতে মন্দির। নতুন পুরনো সব মন্দিরই যেমন পুরনো হতেই হয়, বিগ্রহের জন্মের আদি ও অন্ত থাকতে নেই, রাণীর বাজারেও তাই। যত গলি, তত ঠাকুরের ভিড়, রাণীর-বাজারের ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে রয়েছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে দিবানিশি।

এত গলির কোথায় লোকালয় আর কোথায় বেশ্যালয়, রাণীর বাজারের এই বৈশিষ্ট্যের আদি ও অন্ত কোনটাই নেই।

রাণীর গলি, বাসু পুকুরের গলি, মলপোঁতা পাড়া, এমনি অনেক নামের অনেক গলি, সেই কোন এক কাল থেকেই বুঝি আছে রাণীর বাজারে। আছে তার শেওলা ধরা, বট অশ্বত্থের মাথা চাড়া দেওয়া, বেঁটে খাটো নীচু একতলা দোতলা ঘিঞ্জি বাড়িগুলি। কিংবা যখন যেমন খুশি ছড়িয়ে ভরিয়ে অনিয়মিত চালাঘরের হাট, হালে যাদের নাম হয়েছে বস্তি। সারি সারি সেই সব বাড়ির চাপে শাসিত সরু চাপা গলি। খোপে খোপে বংশপরম্পরায় সেই সব কাক ও শালিকেরা ঘর করে, ডিম পাড়ে, আর কি করে যেন মরে, সব সেই রকমই আছে। আর আছে সেই একই গোত্রের মেয়েরা, যাদের চেহারা, নাম ও বয়স বদলায় প্রায়ই। কোন এক কাল ধরে, দলে দলে যায় আর আসে। কোথা থেকে আসে, যায় কোথায়, তার কোন হাল হদিশ নেই। পশ্চিম আকাশে যখন রক্তের ছিটা লাগে, রাণীর বাজারের মন্দিরে মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা, তখন সেই সব মেয়েরা রং মাখে, সাজে, এসে দাঁড়ায় রাস্তার ধারে।

মন্দিরের দেবতারা যখন চোখ বোজেন, গৃহস্থেরা দিন শেষে বন্ধ ঘরে

শয্যা নেয়, তখন তার পাশে পাশে রাণীর বাজারের বারোবাসর জাগে।

রাণীর বাজার দিনে ও রাত্রে সমান।

আমি দেখি, রাণীর বাজার এক সুবৃহৎ গঞ্জ, তবু ইতিহাসে নাম পায় নি। গোটা মহকুমায় এত বড় গঞ্জ ও বাজার, ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র আর কোথাও এমন সুদীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে পারে নি। কালের কবলে পড়ে কবে মুছে গেছে। রাণীর বাজার আছে জেগে।

সারাদিন এ শহর অনেক লোকের আনাগোনায়, বেচাকেনায়, লাভ-লোকসানের বরাতের খেলায় চঞ্চল হয়ে থাকে। সজাগ-বুদ্ধি, শ্যেনচক্ষু, কড়াক্রান্তির হিসাবে নিকেল মুদ্রার কালো দাগে হাত ভরিয়ে, থুথু দিয়ে কাগজের মুদ্রা গুনে গুনে রাণীর বাজারের দিন কাটে।

দিনের হিসেব-হল্লা-মারামারির পালা শেষ হতে না হতে, রাত্রির মঞ্চের পর্দা যায় উঠে। তখন রাণীর বাজার আর তার বাইরের লোকদের চেনা যায় না। সব একাকার হয়ে যায়।

দিনের বাণিজ্য শেষে, রাতের বাণিজ্য শুরু হয়। তখনো মুদ্রার ঝনঝনা, কাগুজে মুদ্রার খসখসানি, তখনো হাসি হল্লা মারামারি। জড় বস্তুর বদলে, জীবন্ত মাংস বেচা-কেনা চলে সারা রাত্রি ধরে। যে মাংস হাসিতে দোলে, কটাক্ষে জ্বলে, সেই নারীদেহের লেনদেন। দেশী-বিদেশী সোনালী-রুপালী, গাঁজিয়ে ওঠা চোলাই রসের ঢেলখেল রক্তবাহী নর্দমাতে নামে কলকল ক'রে। বিবেক জাতীয় যত ময়লা, সব সাফ হয়ে যায়। কুণ্ডলী পাকানো মত্ততা, নিষ্কুণ্ডল হয়ে মহা মত্ততায় ফণা তোলে। দেহ ও রক্ত-পণ্যের চড়া বাজার রাত্রিভোর জমজমাট। গলিতে গলিতে পণ্যাঙ্গনার ভিড়, বোঝার উপায় নেই কোন্ আলয় কার। গৃহস্থের না বারো-রামার।

আমি দেখি, রাণীর বাজার দিনে জাগে, রাত্রে জাগে। রাণীর বাজারের চোখে ঘুম নেই।

গোটা বঙ্গের যত পৌরসভা, তার সবচেয়ে ছোট পৌর এলাকা নাকি রাণীর বাজার। মাত্র সোয়া বর্গমাইল যার চৌহদ্দি, কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত চৌহদ্দির মধ্যে এত বারোবাসর পাড়া ও বধূর ভিড় নাকি আর কোথাও

নেই। বিশ্বাস না হয়, একবার গিয়ে শহরের ম্যাপটা দেখে এলে হয়, পৌরসভায় চার্টটায় চোখ বুলিয়ে নিলেই হয় একবার। 'ব্রথেল' চিহ্নিত জায়গার যেন কূল নেই।

কিন্তু কেন এত ভীড় ?

এই প্রশ্নটার কাছে এসে, রাণীর বাজারের আদি ইতিহাস এক অস্পষ্ট রহস্যে যেন দুলতে থাকে। নানা মুখে কথা বলে উঠবে রাণীর বাজারের ইতিহাস।

রাণীর বাজারের গঙ্গার ওপারে, দু'শো বছর আগে সেই প্রথম যে কোম্পানীওয়ালারা এসেছিল, ফরাসী না ডেনিস, ইংরেজ না ওলন্দাজ, কে জানে কী তাদের নাম, তাদের যত মুন্সী-মুৎসুদ্দি—বাবু-রাইটার মায় হুকাবরদারদের ফুর্তির জায়গা নাকি ছিল এপারের এই গণ্ডগ্রাম। মেনকা রাজ্যের মত, এ গ্রাম নাকি তখন ছিল শুধু নটীদের।

প্রবৃত্তির এ রঙমহলে এসে ভিড়ল ব্যাপারীদের পণ্য বোঝাই নৌকো ও গরুরগাড়ি। সেই থেকেই নাকি—।

ভুল, ভুল !

প্রতিবাদ ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। কোন এক কালে নটীরা ছিল বটে এই গ্রামে, তাদের রক্তদেহের ঘূর্ণিতে পাক খেতে আসত বটে ওপারের লোকেরা, কিন্তু এত ভিড় ছিল না গণিকাদের। গলিতে গলিতে এমন করে ছড়িয়ে পড়েনি তখন। ওই যে শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে কায়স্থকুলশিরোমণি ঘোষদের সেকেলে ভূতুড়ে বাড়িটা দেখা যায়, খোপে খোপে কোটরে কোটরে যার এখনো বংশপরম্পরায় সেই একই মানুষ ও পায়রারা জন্ম ও মৃত্যুর লীলা খেলছে, সেই বাড়ির পিছন দিকে এখনো যে দেহোপজীবিনী পাড়াটা আছে, সেটা হয়েছিল ঘোষ-বাড়ির জন্যেই। বংশপরম্পরায় না হোক, সেই একই গোত্রের মেয়েরা দলে দলে যায় আর আসে। গোটা পাড়াটার মৌরসী স্বত্ব এখন তাদেরই।

পালপাড়ার কাছে যে-মেয়েপাড়াটা আছে সেই কোন্ মান্ধাতা আমল থেকে, সেখানেও প্রথম মেয়ে এনে বসিয়েছিল ব্যবসায়ী পালেরা।

খাঁয়েদের বাড়ির সংলগ্ন যে মলপৌতা পাড়া নামে গণিকা-গলি সেটাও খাঁয়েদের পারিবারিক ছিল। তেমনি বাস্তু পুরোহিতের বারবধূ পাড়া কোন এক কালে গজিয়ে উঠেছিল এই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের পাড়া ঘেঁষে মুখুজ্জে বাড়িকে ঘিরে।

এমনি করেই যে-পরিবারের যখন নতুন উত্থান হয়েছে, তখনই উত্থানের সব আয়োজনের প্রয়োজনে বসানো হয়েছে উপপত্নীদের আসর।

এই হল রাণীর বাজারের গলিতে গলিতে গণিকালয় বিস্তৃতির ইতিহাস। একদিন যারা ব্যক্তি বা পরিবারতোষিণী ছিল, কালের অমোঘ নিয়মে তারা গণতোষিণী হয়েছে।

শুধু শহরের মধ্যস্থলে রাণীর গলির কোন পারিবারিক ইতিহাস নেই। কোন এককালে ছিল যে রাণীর পাড়া। পাড়া ক্রমে গলি হয়েছে। তারপর পৌরসভার ওয়ার্ড বুকে ওটা রাণী রোড হয়েছিল। কিন্তু তাতেও যখন মান ঘুচল না, যখন খোঁজ পড়ল, রাণীর বাজারে কে আছেন নাম করা মৃত লোক? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। দেখা গেল, গোটা রাণীর বাজারের সব পাড়া থেকেই মৃত মহাপুরুষের নাম আসছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সৎ-শূদ্রের ঘরে ঘরে মৃত পুরুষেরা সকলেই নাকি মহাপুরুষ। শেষ পর্যন্ত তখনকার চেয়ারম্যানের মৃত মামার নামানুসারে রাণী রোডের নাম হয়ে গেল আনন্দ ঘোষ রোড।

বাস্তু পুরোহিতের গলির নামকরণ করলে রাণীর বাজরের সংস্কৃত পণ্ডিত জয়শঙ্কর বিদ্যাবিনোদের নামে। জয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় রাঢ়ি পাড়ারই গুণী এবং স্বনামধন্য ব্যক্তি। রাঢ়ি পাড়ার তিনি মান ও নাম-ধন্য। মলপৌতা পাড়ার নাম দিলে সুজয় খাঁ রোড। সৎ শূদ্র সুজয় খাঁ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধনে ও মানে।

রাতারাতি নাম বদলাল বটে, কিন্তু রাণীর বাজারের মজ্জায় মজ্জায় যে নাম রেখাঙ্কিত আছে, সে লিখন ঘুচল না তাতে। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নামকরণ করেছেন যারা, তারাও হাজার-বার 'থুড়ি' দিয়েও পুরনো নাম ভুলতে পারেননি কোন কালে। নাম

বদলালেও জাত বদলাল না। লেবেল বদলালেও মাল বদলায় না।

শুধু সেদিন দেখলাম আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি থেকে রাণীর বাজারের ডাকঘরের বুড়ো পোস্টমাস্টার একটি পোস্টকার্ড হাতে, আবিষ্কারের পরম বিস্ময়ে ঘাড় দোলাচ্ছেন। নাকের ডগায় নেমে এসেছে তার মোটা লেন্সের চশমা। পাশে দাঁড়িয়ে তার অনেক দিনের পুরনো বুড়ো পিয়ন গিরিধারীলাল।

গিরিধারীও পোস্টকার্ডের ঠিকানা লেখার উপর ঝুঁকে পড়েছে। মজার হাসিতে তার গালের ভাঁজ ঢেকে গোঁফ উঠছে খাড়া হয়ে। হাসতে হাসতে বলল, 'তাজ্জব কি বাত বোড়োবাবু, এমনটি কোথোনো গিরিধারীলাল দর্শন করে নাই। কি পঢ়লেন আর একবার পোঢ়েন বোড়োবাবু।'

পোস্টমাস্টার পড়লেন, 'সুখলাল তেওয়ারি', 'আমবাগান নয়ী বস্তি', 'পোস্ট অফিস—রাণ্ডিরবাজার' 'জিলা—।' গিরিধারী তার বোড়োবাবুকে রেয়াৎ করলে না, হা হা করে হেসে মরল আবার। কিন্তু পোস্টমাস্টার খুবই গম্ভীর। বললেন, 'গিরিধারী হেসো না।'

গিরিধারী হাসি চেপে বলল, 'জী বোড়াবাবু। মগর, চিট্‌ঠিটা খারাপ হইয়ে গেছে, একটা খারাপ কথা লিখিয়ে ফেলেছে।'

পোস্টমাস্টার গম্ভীর মুখে, সর্পিল কপালে সন্ধানী রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'কিন্তু মিথ্যে নয়। পত্রলেখক নিশ্চয় রাণীর বাজারের ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছে, নইলে এরকম খাঁটি নাম সে লিখলে কেমন করে? এতদিনে বুঝলুম রাণীর বাজারের আসল নাম কি? কোত্থেকে এর উৎপত্তি।' বলে তিনি জানালা দিয়ে যে দিকে তাকালেন, সেদিকে রাণীগলির পুকুর। রাণীগলির মেয়েরা তখন পুকুরে স্নান করছে। পোস্টমাস্টারের বুড়ো চোখে সত্য সন্ধানের তীক্ষ্ণ ছটা নতুন করে ঝিলিক দিয়ে উঠল। রাণীর গলির মেয়েদের উদাস অঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে জলকেলি অনেক দেখেছেন। দেখে দেখে আগে শিউরোতেন। যত না রক্তের আনন্দে তার চেয়ে বেশী ভয়ে। কারণ তিনি জানতেন, আসলে মেয়েগুলি মুনির ধ্যান ভাঙার চেষ্টাতেই

আছে। বিশ্বাস করতেন ঐ নির্লজ্জ উলঙ্গ জলকেলি দেখে, জলের তলায় মীন রাজ্যেও নিশ্চয় উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন তিনি ভিন্ন চোখে দেখলেন স্নানরত মেয়েদের। দৃষ্টি ফিরিয়ে পোস্টমাস্টার আবার পোস্টকার্ডের দিকে তাকালেন। আর তার এত দিনের সন্দেহ-ভঞ্জন করে, 'রাণ্ডিরবাজার' জ্বল জ্বল করতে লাগল তাঁর চোখের সামনে।

ব্যাপার দেখে গিরিধারীও গম্ভীর হয়ে গেল। যেন সেও বুঝল, একটা গুরুতর কিছু ধরা পড়েছে।

এবার আমারই একলা হাসির পালা। কিন্তু হাসতে গিয়ে আমিও পোস্টমাস্টারের মত তাকিয়ে রইলাম রাণীর বাজারের দিকে। ভাবতে লাগলাম পত্র-লেখকের কথা। এমন তীক্ষ্ণ-বিদ্রূপটা কে করল রাণীর বাজারকে। বিদ্রূপ যদি নাও হয়, তবে সুখলাল তেওয়ারির এই বিদেশী আত্মীয় হয়তো রাণীর বাজারে প্রবাসকালে, এই নাম নিয়ে ফিরে গিয়েছে। লিখেছে সরল বিশ্বাসেই।

রাণীর বাজার রাণ্ডিরবাজার নয়। তবু রাণীর বাজারকে ওই অশ্লীল নাম ধরে ডাকলে যেন তার আপাত অর্থ একটা খুঁজে পাওয়া যায়।

যে অর্থে রাণীর বাজারকে আমি দেখেছি, পণ্যের হাটে তার দিনে ও রাত্রে সমান লেনদেন। দেখছি, রাণীর বাজার দিনেও জাগে, রাত্রেও জাগে।

কিন্তু সেই হিসেবে ও শহরের নাম হওয়া উচিত ছিল নটীর হাট। রাণী কোথায়?

এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় রকমের বিদ্রূপ করেছে রাণীর বাজারের সেই সব পুরনো ঘরানা অধিবাসীদের, যারা কোন এক কালের এক রাণীকে তাদের স্বজাতি করে, ইতিহাসে পড়ে পাওয়া যোল আনা কুড়িয়ে নিতে চেয়েছে।

সঠিক জবাব পেতে হলে, রাণী রোডের সবচেয়ে পুরনো বেঁটে-খাটো একতলা মুমূর্ষু জীর্ণ বাড়িটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

যে-বাড়িটিকে চারদিক থেকে পিষে, চলতি কথায়, 'রাণীর বাড়ির লাইন' চলে গেছে স্টেশনের কাছ থেকে পশ্চিমে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। রাণী রোডের এই আধ মাইল পথের ধারে যত বাড়ি, সবই এখনও রাণীর মেয়ে বিরানব্বুই বছরের সৌরভীবালা ভোগ করছে।

যে সৌরভীবালা এখনো সেই ভেঙেপড়া পুরনো একতলা বাড়ির মধ্যেই আছে।

আমি আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখছি, সৌরভীবালার লোলচর্ম এখন গলে গলে পড়ছে। পশ্চিমদিকের জানালা খুলে দেওয়া ছোট খুপরি ঘরে নগ্ন সৌরভীবালা গলা গলা অপলক চোখে তাকিয়ে আছে বেলাশেষের রক্তাম্বর আকাশের দিকে। প্রাণ তার ঠোঁটের কিনারায় এসে ঠেকেছে। কিন্তু শমনের দেখা নেই।

জীবিতদের মধ্যে, সৌরভীবালার খসে পড়া মাংসের ভাঁজে ভাঁজে রাণীর বাজারের চাক্ষুষ ইতিহাস আঁকা রয়েছে। সৌরভী তার মায়ের বাজার দেখেছে, সে বাজার ধ্বংস হতে দেখেছে।

সৌরভীবালার গায়ে রাণীর বাজারের মায়ামুগ্ধজীবী মানুষের কামিনী ও কাঞ্চন, প্রবৃত্তি ও সম্পদের বিচিত্র কাহিনী রয়েছে লেখা।

ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে সৌরভীবালা অতীতদিনের কথা ভাবছে।

বাঁশীর সুর শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, আমার সেই কালের রাখালটি এসে দাঁড়িয়েছে স্টেশনের সামনে, নর্দমার ধারে, লোহার রেলিংটার গায়ে। আর ওকে ঘিরে ধরেছে ওর সবচেয়ে নিকট বন্ধু রিকশাওয়ালারা।

নাম ওর রাজা। কবে থেকে যে রাজা এখানে এসে তার বাঁশীর সুর তুলেছে, লক্ষ্য করিনি। আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি নিয়ে বিভোর হয়ে ছিলাম। আর কোন কিছুই কানে যাবার কথা নয়।

কিন্তু প্রথম যেদিন আমি ওকে দেখেছিলাম, ওর বাঁশী আমার কানে গিয়েছিল, আমার মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল, সেইদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। তখন কি আমি জানতাম, রাজা বাঁশীতে তান ধরেছে। মনে করেছিলাম, যে নাটক অভিনীত হচ্ছে আমার চোখের সামনে, তারই আবহ সঙ্গীত রাগিনী বাজছে আমার বুকের অদৃশ্য পটে।

সেদিন আমি দেখছিলাম, রাণীর বাজারের দ্বিজপাড়ার নৈয়ায়িক পণ্ডিত, লোলচর্ম বৃদ্ধ ন্যায়তীর্থ চণ্ডীচরণকে তার যুবতী পৌত্রবধূ তুলসী মাথায় ভাতের মাড় ঢেলে দিচ্ছে। মাড় ঠাণ্ডা। বোধহয় জল মেশানো ছিল।

ন্যায়তীর্থ চোখে দেখতে পান না। বিচার-কুটিল সেই লোমশ ভ্রূ-জোড়া এখন কয়েকটি সাদা লোমে এসে ঠেকেছে। প্রশস্ত কপালে বুদ্ধির সেই থির-বিজুরি শিখা নেই, কালের গতি তার সহস্র রেখা নিয়ে কপাল থেকে নেমে এসেছে পায়ে। বৃদ্ধ বটের নিম্নগামী ঝুরির মত।

ন্যায়তীর্থ ভাতের মাড় তাঁর সুবৃহৎ জিহ্বা দিয়ে চেটে নিয়ে, অবাক হয়ে বললেন, 'দুধ? আমাকে দুধে স্নান করালি নাতবউ?'

নাতবউ পিছনে দাঁড়িয়ে টিপে টিপে হাসছিল। আঁচল তার লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছিল হাসির দমকে। তবু তার আর্যসুলভ নীল চোখে একটি কুটিল রাগ ও ঘৃণার ঝিলিক হানছিল।

আমার নড়বার ক্ষমতা ছিল না। আমি শুধু তুলসীর রূপের সঙ্গে এই দৃশ্যের সাদৃশ্য খুঁজে মরছিলাম।

রাণীর বাজারের পাশের গ্রাম, গ্রাম নয়, শহরেরই অংশ এখন, বৈদিকপাড়ার জ্যোতিষশাস্ত্রী অনন্তবিকাশের মেয়ে সর্বসুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে তুলসী। সুগৌরী নয়, তার চেয়েও বেশি, টোকা মারলে বুঝি রক্ত ফুটে বেরোয়, এমনি রং তুলসীর। পিঠে এলানো সুদীর্ঘ কেশপাশ কালো নয়, পিঙ্গল নয়, তার মাঝামাঝি। অযত্ন-লাঞ্ছিত সেই চুলের নীচের দিকে কিছু জট পাকিয়েছে। রক্তরেখা ঠোঁট, নীল চোখ, টিকলো নাক। এই পুরনো সেকেলে নীচু ছাদ

বাড়িটার অন্ধকারে তুলসীর রূপের দীপ্তিতে যেন একটি সাপিনীর মত সর্বনাশ বয়ে বেড়ায়। সর্বনাশেরই মত তার নিঃসন্তান নিটুট শরীরের উদ্ধত ধার। কী এক অজানা অপরিচিত প্রলয়ের বাসনায় যেন তার অকূল যৌবন জ্বলছে দপ্ দপ্ করে। গায়ে তার জামা নেই, সামান্য সস্তা মিলের এক ভাঁজ শাড়ি তার শাসন মানে না। কপালে নয়, সীঁথিতে তার ডগডগে সিঁদুর। হাতে কয়েকগাছি তামার পাতে সোনার রং লাগানো চুড়ি। মণিবন্ধে নীল দাগ হয়েছে, ঘামের সঙ্গে তামার কষ মিশে মিশে।

একমাত্র নাতি জগদীশের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রী যখন সম্বন্ধ করতে চাইলেন তুলসীর, মেয়েকে দেখতে চেয়েছিলেন ন্যায়তীর্থ। চোখে দেখতে পান না, তবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, শুনে শুনে মিলিয়ে নিয়েছিলেন সমস্ত সুলক্ষণ। আকুঞ্চিত কেশ, মণ্ডলাকার মুখ, দক্ষিণাবর্ত নাভি, সুবর্ণোজ্বল রং, রক্তপদ্মের মত হাত যদি হয়, তবে সে নারীপ্রধানা পতিব্রতা হবে। অন্যথায় মুখে চন্দ্রপ্রভা, দেহে সূর্যচ্ছটা, বিশাল চোখ, বিম্বফল-রক্তবর্ণ ঠোঁট, তুলসীর কি সেই চির-সুখবতীর রূপ আছে? হাতে তার বহু রেখা কিংবা খুবই স্বল্প রেখা নেই তো? কিংবা হাতের রেখা কালো, গোল চোখ, রোমাবৃত স্তন, নাভিদেশ থেকে অচ্ছিন্নভাবে উদ্গত ঊর্ধ্বদিকে বৃত্তাকারে ওঠা পিঙ্গল রোমাবলী পদভারে ধরিত্রী-কম্পিত নয় তো জ্যোতিষশাস্ত্রীর মেয়ের? না, চক্রাকার কিংবা অঙ্কুশামণ্ডল চিহ্নিত হাতের কোন দাবী নেই ন্যায়তীর্থের। নাতি তার কেরানী, দৈবক্রমে তার রাজা হওয়ার আশা করেন না তিনি। তবে, সে চিহ্ন থাকলে ন্যায়তীর্থ ভাগ্য বলে মানতেন। তুলসী রাজপত্নী কিংবা রাজমাতা হতে পারত। কিন্তু স্নেহযুক্ত পায়ের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি যেন মাটিতে চেপে চেপে বসে চলবার সময়। অন্যথায়, ন্যায়তীর্থের সদর দরজার পাল্লা যে সব সময় খোলা পড়ে থাকবে, বাইরের জগতে দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অন্ধকারে যে সেখান থেকে অপদেবতার হাতছানি সব সময় দেখা যাবে। ঘরের লক্ষ্মী নিশিগ্রস্তা হয়ে, অলক্ষ্মীর হাত ধরে সদর দরজা পার হয়ে যাবে যে!

অনেক, অনেক প্রশ্ন সেদিন করেছিলেন অন্ধ বৃদ্ধ ন্যায়তীর্থ। হয়তো একই জাতের সব সুলক্ষণগুলি পাননি, কিন্তু সব মিলিয়ে, শাস্ত্রানুযায়ী, তুলসী অতি উত্তমা। রূপে ও গুণে সর্বসুলক্ষণা।

এই সেই সর্বসুলক্ষণা, সেদিনের ষোড়শী আজ বাইশ বছরের যুবতী তুলসী। ন্যায়তীর্থের মাথায় ও গায়ে ঠাণ্ডা ফ্যান ঢেলে, মুখে আঁচল চেপে হেসে মরছিল চুপিচুপি। তবু সুলক্ষণ ঠোঁট ও নাকের কুঞ্চনে, চোখের নীল দ্যুতিতে তীব্র ঘৃণা ও চাপা রাগ স্ফুরিত হচ্ছিল।

আর স্বাদ মরে যাওয়া জিভ দিয়ে ভাতের ফ্যান চাটতে চাটতে ভাঙা ভাঙা কিন্তু খুশি খুশি গলায় জিজ্ঞেস করছিলেন ন্যায়তীর্থ, 'আমাকে দুধ-স্নান করালি রে?'

জবাব দিচ্ছিল না তুলসী। একলা ঘরে, আলুলায়িত বেশে, নিঃশব্দে হেসে হেসে এই বিচিত্র তামাসা দেখছিল।

ন্যায়তীর্থের জিভের স্বাদ অনেকদিনই মরেছে। হাতেও বুঝি আর তেমন সাড় নেই। প্রায় উলঙ্গ বেশে, দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে, হাত দিয়ে মাথায় ও গায়ে অনুভব করে দেখছিলেন, তাঁর কল্পিত দুধের গাঢ়তা কত। দেখছিলেন আর হাত বুলিয়ে এনে চেটে চেটে খেতে খেতে বলছিলেন, 'সকাল থেকে কিছুই খেতে দিলি নে নাতবউ, সারা গায়ে দুধ ঢেলে দিলি? তোর পাগলামি কি কোনকালে ঘুচল না?'

এবার তুলসী তার সুলক্ষণা রক্ত বিম্বোষ্ঠের ফাঁকে, শাদা ঝকঝকে দাঁতে ঝিলিক হেনে বলেছিল, 'না।'

ন্যায়তীর্থ বলেছিলেন, 'দুধটা ক্ষীর ক'রে ফেলেছিস রে। দুটি ভাতে মেখে যদি দিতিস।'

তুলসীর গলায়ও সুরলোকেরই ঝংকার। কিছু না ব'লে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। তারপর বিদ্রূপে ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু এটা কী ন্যায়, তা বললেন না তো ঠাকুর্দা?'

'ন্যায়তীর্থ হাত চাটা বন্ধ করেছিলেন। দৃষ্টিহীন চোখে, কিছুক্ষণ পলক না ফেলে খালি চোপসানো লালাসিক্ত ঠোঁটের ফাঁকে মস্ত বড় জিভটা বার করে ভাবছিলেন। তারপরে বলেছিলেন, 'এটা? এটা

বোধহয় লাজাবন্ধ ন্যায় হল, কি বলিস, অ্যাঁ ?'

তুলসী ভ্রূকুটি ক'রে জিজ্ঞেস করেছিল, 'লাজাবন্ধ কেন ?'

ন্যায়তীর্থের মুখে শিশুর হাসি ফুটেছিল। অনেকক্ষণ ধরে আড়ষ্ট জিভ নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন, 'অর্থাৎ খৈয়াবন্ধন হ'ল আর কি। লাজাবন্ধেরই আর এক নাম। ক্ষুধার্ত লোক থামের দু'পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে, জোর করে খই নিয়েছে। না পারে হাতভিন্ন করতে, তা হ'লে খই পড়ে যায়। এদিকে বাতাসেও উড়ে পড়ে যাচ্ছে। খিদেও মানছে না। একে বলে লাজাবন্ধ।'

তুলসী বলেছিল, 'তা জানি, কিন্তু বললেন কেন ?' কালো কুঞ্চিত ভ্রূ-লতায় সন্দেহ ঝিকিমিকি করছিল তুলসীর।

ন্যায়তীর্থ বলেছিলেন, 'তুই যে সে রকম করলি নাতবউ। আমার খিদে পেয়েছে, তুই মাথায় ঢেলে দিলি দুধ। না আছে পাত্র, না পারি হাত দিয়ে তুলে খেতে।' বলে আবার চাটছিলেন হাত দিয়ে তুলে এনে।

আমি তবু দেখছিলাম রাণীর বাজারের অতিবৃদ্ধ শেষ নৈয়ায়িকের শিশুর মত নির্মম খেলা। আর তার সর্বসুলক্ষণযুক্তা নাতবউ তুলসীকে। অপরূপ রূপসী, অঙ্গে অঙ্গে যার যৌবনের পাত্র উছলে পড়ছে। ন্যায়তীর্থ পিতামহ-শ্বশুরের কাছে ন্যায় সম্পর্কে অনেক কথা শিখেছে তুলসী।

বৈদিকপাড়ার ভুজঙ্গ মাস্টারের পাঠশালাতেই শুধু পড়েনি তুলসী জ্যোতিষশাস্ত্রী অনন্তবিকাশের মেয়ে তার তর্করত্ন জ্যাঠামশায়ের কাছেও কিছু কিছু পড়াশোনা করেছে। ভুজঙ্গ মাস্টারের স্কুলে হয়-তো পড়া আরো কিছু বেশিই হত। স্কুলটা ঠিক প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। মধ্যম বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ 'মাইনর' ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে মাস কয়েকের মধ্যেই তুলসীকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়েছিল।

বৈদিকপাড়ার মেয়েদের মধ্যে যখন কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুল ছেড়ে কলেজ যাবার অধিকার মিলেছে, জ্যোতিষশাস্ত্রীর বাড়িতে তখন মেয়েদের পাঠশালায় যাবার দ্বিধাগ্রস্থ অনুমতি পাওয়া গেছে। বোধহয় মোটামুটি চিঠিপত্র লেখা আর হিসেব রাখতে শেখাবার তাগিদ ছিল।

বাড়িতে শেখাবার সুযোগ থাকলে নিশ্চয় স্কুলে যাবার অনুমতি দেওয়া হত না।

কিন্তু ভুজঙ্গ মাস্টারের স্কুলে ক্লাস সিক্স্‌এ উঠেই তুলসীর একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। এখন মনে পড়লে নিশ্চয় তুলসী হেসে উঠবে। শশী ভট্‌চাযের বাড়ির পাশ দিয়ে স্কুলে যাবার সময়, শশী ভট্‌চার্যের বড় ছেলে হোঁদা তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখত। হোঁদা তখন বৈদিকপাড়ার হাইস্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। প্রথম প্রথম মজা, তারপরে তুলসীর ভালই লাগত। কেমন যেন বায়স্কোপি বায়স্কোপি নাটুকে নাটুকে ব্যাপার ব'লে মনে হত। কিন্তু তা বলে মোটেই ঠাট্টার ব্যাপার নয়কো। তুলসীর মনে হয়েছিল—একটা ভীষণ ব্যাপার করেছে সে। খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা অপরাধের মনোভাব এসে গিয়েছিল তার মধ্যে। যেহেতু অপরাধ। সেইহেতুই গোপন করার প্রতারণা। কিন্তু বেশ লাগছিল। ফ্রক পরা জ্যোতিষশাস্ত্রীর বাড়িতে আটের মধ্যেই খতম। দশে পড়তে পড়তেই তুলসী বেশ ছেয়ালো ছেয়ালো লম্বা হয়ে উঠেছিল। শাড়ি পরে তাকে তখন বেশ বড়সড়ই দেখাত। কিন্তু দশ হলে কি হবে, তুলসী মনে করত, তিন দশে তিরিশের মত ভারী ব্যাপার ঘটছে তার জীবনে। হোঁদা অনেক নাটক নভেল পার হয়েছে। ও টুক্‌ করে একদিন এক চিঠি ফেলে দিল। মা গো! কী ভয় তুলসীর। মনে হয়েছিল, সারা বৈদিকপাড়ার লোক ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করছে। গলিতে গিজ্‌গিজ্‌ করছে লোক। যদিও, বৈদিকপাড়ার নিরামিষাশী ঘি খাওয়া ঘেয়ো কুকুরটা ছাড়া, আর কেউই কাছাকাছি ছিল না। চিঠিটাকে খাবার মনে করে কুকুরটা ল্যাজ নেড়েছিল। তুলসী চোখ কান বুজে কুড়িয়ে নিয়েছিল সেটা। অপরূপ সেই চিঠির ভাষা। বাড়ি ফিরে, লুকিয়ে ছাদে বসে সেই চিঠি পড়েছিল তুলসী। আর তার বুকের শব্দ বোধহয়, নীচে রান্নাঘরে মায়ের কানেও যাচ্ছিল। হোঁদা চুম্বন জানিয়েছিল, জবাব চেয়েছিল মাথার দিব্যি দিয়ে।

কী লজ্জা! হে ভগবান, ক্ষমা কর। চুম্বন, মানে মনে মনে হোঁদা

আমাকে চুমো খেয়েচে ? আ ছি ছি ছি !

কিন্তু মাথার দিব্যি দিয়েছে জবাবের জন্য। কি লিখবে তুলসী ? সে তো এসব কথা লিখতে পারবে না। তার মাথায় আসবে না। হাতও সরবে না। কিন্তু হোঁদাটা কি বিশ্রী বানান ভুল করেছে। ওমা, বাংলায় আবার কেউ এত বানান ভুল করে নাকি !

একদিন দুদিন তিনদিন। রোজ হোঁদা দাঁড়িয়ে থাকত জবাবের জন্য। মজার বিষয়, কেউ কথা বলত না। বাধ্য হয়ে হোঁদা আবার পত্র ছুঁড়ে দিল। অনেক কাকুতি মিনতি। 'দেবী', 'দয়াময়ী' কি লেখেনি হোঁদা।

এর পরে না লিখলে চলে না। হোঁদাটা ক্লাস টেনে পড়ে। তবু কি বিশ্রী বানান ভুল। তুলসী জবাব দিয়েছিল, 'আমি তোমার মত অত কথা লিখিতে পারি না। আর তোমার অনেক বানান ভুল আছে। কেন এরূপ হয় ? আর তোমার ক্রিয়াপদ ভুল হয়। আমার খুব ভয় করে। শশীকাকা দেখিলে মরিয়া যাইব। আর বাবাকে বলিলে মা জানিবে। মা কাটিয়া ফেলিবে।'

হোঁদার কী দুর্ভাগ্য। প্রেমিকা দু'লাইন জবাব দিয়েছে, তার মধ্যে এক লাইন ভয়। আর এক লাইন ভুল ধরা।

কারণ তুলসীর মেধা ছিল। আয়ত্ত করার ক্ষমতা ছিল। ভুজঙ্গ মাস্টারের স্কুলে সে ছিল ছাত্রী। তর্করত্ন জ্যাঠার সে ছিল প'ড়ো ভাইঝি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সংস্কৃতে তাকে কথোপকথনও করতে হ'ত। সংস্কৃত লেখা এবং পড়াও দিতে হত।

তবে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। সম্পূর্ণ স্বাধীন প'ড়ো তুলসী। তর্করত্ন টিমটিমে টোল নিয়ে ব্যস্ত। ভাইঝিকে নিজে ডাকতেন না। ভাইঝি এলে খুশী হয়ে, খানিকটা খেলাচ্ছলেই নিয়ে বসতেন। কিন্তু নিয়ে বসার মধ্যে কিছু নিয়ম নীতি ছিল। বসতেই যখন হবে, তখন আর ফাঁকি দিলে চলবে না।

হোঁদার পত্রপ্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত গড়াল অনেকদূর। জবাব পেয়ে হোঁদা আবার একটা বিরাট পত্র ছুঁড়ে দিয়েছিল। তুলসী সেগুলি

প্রাণ ধরে ধ্বংস করতে পারেনি। তা কখনও পারা যায়। কতবড় একটা ব্যাপার। কী ভীষণ! সুতরাং পত্র রাখার জায়গাটাও সে সেইরকম খুঁজে বার করেছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রীর প্রাচীন থেকে আধুনিক কয়েক হাজার পঞ্জিকা ছিল একটি কুটুরিতে। খুবই প্রয়োজনীয় এবং যত্নের বস্তু সেগুলি। সেই পাঁজির আণ্ডিলের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রক্ষিত ছিল তার নিষিদ্ধ গুপ্ত সম্পত্তি। আর ঠিক সেই সময় জ্যোতিষশাস্ত্রীর হাত পড়েছিল সেখানে। প্রথমটা উনি বুঝতেই পারেননি, অর্বাচীন হস্তাক্ষরে এবং ভাষায় কথাগুলি কী লেখা ছিল। কিন্তু না দেখেই বা ফেলে দেন কী করে? কত লোকে কত জন্ম ঠিকুজি কুষ্টির বৃত্তান্ত লিখে দিয়ে যায়। তবে চোখে ছানি তো পড়েনি। 'ওগো প্রিয়তমা তুলসি রাণি'র মানে কী? মানে একমাত্র গৃহিণীর কাছে উর্ধ্বশ্বাস গমন এবং পত্রাবলী দর্শানো আর তৎক্ষণাৎ গৃহিণীর প্রথম নির্দেশ, 'ইস্কুল যাওয়া বন্ধ'। তারপর জ্যোতিষশাস্ত্রীর 'মুরোদ' সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণন এবং 'নিজের কাজে' যাবার নির্দেশ। তারপরেই তুলসীর কেশাকর্ষণ, বিশেষভাবে রান্নাঘরেই টেনে নিয়ে প্রহার এবং গর্ভজাতার সম্পর্কে তার 'অনেক আগেই জানা' সব বিশেষণ দান, কুলাঙ্গার, রাক্কুসি, সর্বনাশী, কালকুটী। শেষে কড়া হুকুম, 'বাড়ি থেকে বেরুনো, একেবারে নিষেধ।' নিষেধ তো নিষেধই। কয়েকটা দিন বুঝি মনটা আনচান করেছিল তুলসীর। তারপর কবে যে ভুলে গিয়েছিল, তুলসীরও আর মনে নেই। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছিল সেই থেকে, এইটুকুই মনে আছে। কিন্তু তর্করত্ন জ্যাঠার কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ হয়নি। একই বাড়ির পাঁচিলের এপাশে-ওপাশে। শরিকানা বাড়ি, মাঝখানে দরজা। প্রথম প্রথম তাতেও মা খোঁজ নিতেন। কারণ, জ্যোতিষশাস্ত্রীর দরজা বন্ধ থাকলে কি হবে। তর্ক-রত্নের কপাটে তো কোন পাহারা নেই।

কিন্তু তার দরকারই ছিল না। মায়ের সংসারের কাজ অনেক। স্কুলে না গেলেও বাড়িতে বান্ধবীর ভিড় কিছু কম ছিল না। তার ওপরে তর্করত্ন জ্যাঠা তো ছিলেনই। সময় কোনখান দিয়ে কেটে যেত টের পাওয়া যেত না। জীবনে একটি মস্ত বড় ঘটনা ঘটছিল বলে যে মনে

হচ্ছিল তুলসীর তা কবে কখন তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেছে, মনেও ছিল না।

ভুজঙ্গ মাস্টার এসেছিলেন থপ্‌থপিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রীর কাছে। অমন মেধাবিনী মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই। এভাবে তাকে স্কুল ছাড়ানো একেবারেই কাজের কথা নয়। এ মেয়ের মাইনর বৃত্তি কেউ আটকাতে পারে না। তবে অভিভাবকের সহসা এরকম সিদ্ধান্ত কেন ?

সিদ্ধান্ত হচ্ছে সিদ্ধান্ত। এর ওপরে আর কথা নেই। স্কুলে আর পড়ানো হবে না।

কেবল হোঁদা অনেকদিন বিরহ ব্যাকুল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তুলসী আর আসেনি। বেচারী কিছুই জানতে পারেনি। কেবলি ছটফট করত। কে জানে, বানান আর ক্রিয়াপদের ভুলই এত বড় কাণ্ডটা ঘটালে কি না। সাহস করে কয়েকদিন জ্যোতিষশাস্ত্রীর বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে এসেছিল। কা কস্য পরিবেদনা।

তারপর ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সংসারের কাজ আর তর্করত্ন জ্যাঠার কাছে বসে কেটেছে তুলসীর। তর্করত্ন জ্যাঠা বলতেন, তুলসীর মেধা আছে। ইচ্ছে করলে ও সব শিখতে পারে।

কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রী নিজে যে ঠিকুজি-কুষ্ঠি মিলিয়ে দেখেছিলেন মেয়ের। ষোড়শ বর্ষে বিবাহ। স্বামী এবং বিপুল বিত্ত তুলসীর কপালে লেখা ছিল।

ঘৃণায় ও শ্লেষে আগুনের মত দপদপিয়ে ওঠে তুলসীর সারা মুখ। কী অপূর্ব স্বামী আর বিত্ত সে ভোগ করছে। আহা জ্যোতিষশাস্ত্রের কী মহিমা! দেখুক, জ্যোতিষশাস্ত্র দেখে লজ্জায় মাথা নামাক, কী পেয়েছে তুলসী জীবনে।

কিন্তু পিতামহ শ্বশুর স্বয়ং নৈয়ায়িকও বলেন, তুলসী ইচ্ছে করলে নৈয়ায়িক হতে পারে। তার তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি তিনি উপলব্ধি করেছেন নাকি।

সে কথা মনে করে তুলসীর হাসি আরো বিদ্রূপাত্মক হয়ে ওঠে।

সেদিন লাজাবন্ধ ন্যায়ের কথা শুনে, তুলসী তীব্র হেসে বলেছিল,

'কী ভাগ্যি বকাণ্ড প্রত্যাশা ন্যায় বলেননি ঠাকুর্দা।'

ছি! ছি ছি ছি! আজকাল কোন কথাই আটকায় না তুলসীর মুখে। বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতের মতই, যা মুখে আসে, তাই বলে দেয়।

কিন্তু সহসা পুলকে ছ'মাসের শিশু যেমন মায়ের কোলে হেসে ওঠে, গোঙা স্বরে তেমনি ক'রে চোপসানো ঠোঁটে হেসে উঠেছিলেন চণ্ডীচরণ। হাসির বেগে, লালা গড়িয়ে পড়েছিল ঠোঁটের কষ বেয়ে। বলেছিলেন, 'তুই বড় দুষ্টু নাতবউ। বকের মত বুঝি আমি ষাঁড়াগুকোষের লোভে ছুটব?'

কিন্তু তুলসী আর হাসছিল না। বিশাল দুই চোখে অপরিসীম ঘৃণা ও রাগ নিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়েছিল ন্যায়তীর্থের দিকে।

কেন? কিসের এত রাগ আর ঘৃণা। অশক্ত জড় পদার্থের মত সেই অতীত তীক্ষ্ণধী নৈয়ায়িকের ওপর রূপসী নাতবউ তুলসীর এ কিসের প্রতিশোধ?

আরো দেখেছি, সুন্দ-উপসুন্দের, সৌন্দর্যের তিলে তিলে গড়া তিলোত্তমা তুলসী, হাতের ব্রোঞ্জের চুড়ি থেকে সেফটিপিন খুলে, কেমন ক'রে ন্যায়তীর্থের গায়ে খুঁচিয়েছিল। নিঃশব্দে, বসে বসে খুঁচিয়েছিল। ন্যায়তীর্থের এমনি সাড় নেই, কিন্তু এ যন্ত্রণার অনুভূতিটুকু ছিল। চোখে দেখতে পান না। মনে করেছিলেন, কাঠপিঁপড়ে গায়ে উঠে কামড়াচ্ছে তাঁকে। তাঁর স্থবির হাত সহজে পৌঁছুচ্ছিল না পিঁপড়ে-কাটা জায়গায়। ন্যায়তীর্থ শিশুর মত চিৎকার করছিলেন, 'নাতবউ, ও নাতবউ, ওরে ভাই শীগ্‌গির আয়, কাঠপিঁপড়ে না কিসে আমাকে কামড়ে মেরে ফেলছে।'

আমি দেখছিলাম, সর্বনাশী কাঠপিঁপড়েটার চাপা হাসিতে মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে। হুল তার নিষ্ঠুর ও নির্মম। রক্তরেখা ঠোঁটের কোণ তবু কুঁচকে রয়েছে, চোখে তবু চক্‌চক্ করছে একটি চাপা রোষ।

না, কাঠপিঁপড়ে নয়। তার হুল ফোটাবার মধ্যেও একটি সততা আছে। সে জীবনের ভয়ে ফোটায়। কিন্তু তুলসী? যাকে আমি দেখছিলাম, সর্বসুলক্ষণযুক্তা যুবতী, নিঃসাড়ে সেফ্‌টিপিন ফোটাতে

গিয়ে যার আঁচল নেই বুকে, চুল এলিয়ে পড়েছে মাটিতে আর মাঝে মাঝে সরে গিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে, রক্তবিম্বোষ্ঠ ঘরের মেঝেয় চেপে রাখছিল শব্দ চাপবার জন্যে। সে কে? কোন্ জীব?

ন্যায়তীর্থ পরিত্রাহি চিৎকার করছিলেন, 'ওরে জগুর বউ, মারা গেলুম রে ভাই।'

তুলসী চলে গিয়েছিল নিঃশব্দে। পাশের ঘর থেকে জবাব দিয়েছিল তার সুরঝংকৃত গলায়, 'কি বলছেন ঠাকুর্দা?'

বলতে বলতে ছুটে এসেছিল তুলসী। নৈয়ায়িকের দৃষ্টিহীন চোখের জল তখন তাঁর মুখের কালের সহস্র রেখা বেয়ে টপ্‌টপ্ ক'রে পড়ছে। বলেছিলেন, 'এসেছিস ভাই? কই, আয়। এই দ্যাখ্, দ্যাখ্ তো আমাকে কিসে হুল ফোটাচ্ছে? পাছাটা আর রাখেনি কামড়ে কামড়ে।'

হাসি ছিল না, রাগও বুঝি ছিল না তখন তুলসীর সুন্দর মুখে। সে তার রক্ত-পদ্ম-রং সুলক্ষণ হাতে ন্যায়তীর্থের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। ন্যায়তীর্থ চোখ বুজে, ভাঙা ভাঙা চাপা আর্তস্বরে, অসহায়ের মত বলছিলেন, 'হে জগদীশ্বর, হে ভগবান, হে পতিতপাবন, মুক্তি দাও! মুক্তি দাও!'

তুলসী তখন বৃদ্ধ নৈয়ায়িককে বুকের ওপরে টেনে নিয়েছিল। সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, আর ন্যায়তীর্থের মনে হয়েছিল কালের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন সত্যি মায়ের কোলে শিশু। কৈশোর ও বলিষ্ঠ যৌবন তার ভবিষ্যতে।

তিনি তুলসীর স্নেহের আলিঙ্গন অনুভব করছিলেন। বলেছিলেন, 'মা, তুলসী মা আমার, সংসার বড় অন্ধকার রে।'

তুলসীর কি কোন ভাবান্তর হয়েছিল বৃদ্ধ চণ্ডীচরণের যন্ত্রণা ও মৃত্যু-কামনা দেখে? বুঝতে পারিনি। কারণ ছোট্ট মেয়েটির মত কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল তুলসী, 'কি হয়েছিল ঠাকুর্দা?'

ন্যায়তীর্থের চোখে তখনো জলের দাগ। যেন ক্রন্দনরত শিশু মায়ের কোল পেয়ে শান্ত হয়েছে। বলেছিলেন, 'কি জানি, যেন মনে

হচ্ছিল কয়েকটা কাঠপিঁপড়ে।'

তুলসী বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো একটাও দেখতে পাচ্ছিনে,' বলতে বলতে আবার হাসি চমকে উঠেছিল তুলসীর মুখে, বলেছিল, 'এটা কিন্তু ঠাকুর্দা, অন্ধহস্তি-ন্যায় হয়ে গেল!'

শোনা মাত্র নৈয়ায়িকের অন্ধ চোখে সুদূর চিন্তা ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'যথা?' ব্যথা বেদনা ভুলে হঠাৎ ঋজু হয়ে উঠেছিলেন।

তুলসী বলেছিল, 'যথা, আপনার আন্দাজ দেখে বলছি। কাকে কি ভেবে বসে আছেন। হয়তো বিছের জালি উঠেছিল আপনার গায়ে, আপনি তাকেই কাঠপিঁপড়ে বলছেন।'

বৃশ্চিকের চিন্তায় একবার বুঝি কাঁটা দিয়ে উঠেছিল ন্যায়তীর্থের গায়ে। বলেছিলেন, 'তা হবে। তবে সেটা কিন্তু অন্ধ-হস্তি ন্যায় হল না। এটা এখন কি ন্যায় হল জানিস নাতবউ? এটা হল দগ্ধ পত্র ন্যায়।'

'কেন?'

ন্যায়তীর্থের সারা মুখে গাঢ় ছায়া পড়েছিল। বলেছিলেন, 'তাই নয় কি? পাতা পুড়ে গেলে, পাতার আকারই থাকে। তবু সে পাতা পোড়া।' বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'হে পরমেশ্বর, হে জগদীশ্বর, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।'

আবার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছিল তুলসীর। বলেছিল, 'কিন্তু মুক্তি আপনার কেমন করে হবে ঠাকুর্দা?'

'কেন রে?'

'শুনেছি, যখের কখনো মুক্তি হয় না।' বলে তুলসী যেন সরোষে উঠে পড়েছিল চণ্ডীচরণকে ছেড়ে। যেন তীব্র বিষ উপ্‌ছে পড়েছিল তার সুন্দর ঠোঁট বেয়ে। বলেছিল আবার, 'আপনারও মুক্তি নেই, আমিও কোন দিন মুক্তি পাব না। তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দেব, আপনার ব্যবস্থা করবে ন'কু ঠাকুরপো।'

ন্যায়তীর্থ চমকাননি। একথা অনেকবার শুনেছেন তুলসীর মুখে। দন্তহীন মাড়িতে শিশুর মত হেসে বলেছিলেন, 'পাগলি আর কাকে

বলে।'

বিষ আরো ছিল তুলসীর রক্তঠোঁটের কোণে। তীব্র চাপা গলায় বলেছিল, 'থাক, আর শাক দিয়ে আপনি মাছ ঢাকবেন না। আপনার ওসব চালাকি আমার টের জানা আছে। ছ'বছর ধরে তো দেখছি।'

ন্যায়তীর্থ তেমনি হেসেই বলেছিলেন, 'ছ'বছর ধরে কি দেখলি লো?'

রাগে ও ঘৃণায় তখন যেন ফেটে পড়ছিল তুলসী। বলেছিল, 'দেখলাম আপনার ভণ্ডামি।'

নৈয়ায়িক ডেকে উঠেছিলেন, 'হে ভগবান!'

তুলসী তখনো বলেছিল, 'আপনার মরণ দেখলাম। আপনার ঠাঁই কোনদিন নরকেও হবে না জেনে রাখবেন।'

চণ্ডীচরণ আর্তস্বরে ডাকছিলেন, 'মা জগদম্বে!'

অকস্মাৎ অগ্নি-মূর্তি ধ'রে দাঁড়িয়েছিল তুলসী। এলো চুলে, বিস্রস্ত বেশবাসে, সেই তুলসী যত সুন্দরী ততই ভয়ংকরী। যেন দু'হাত তুলে সে আঘাত করতে আসতে গিয়ে, থেমে বলেছিল, 'কোন মা জগদম্বে আপনাকে রক্ষে করতে পারবে না। যে আপনার গায়ের পোকা বেছে, নোংরা ধুয়ে সব করছে, তার হাতেই আপনাকে থাকতে হবে, বলে রাখলাম।' ব'লে চলে গিয়েছিল তুলসী। সারাদিন আর চণ্ডীচরণের ঘরে ঢোকেনি, খেতেও দেয়নি। ন্যায়তীর্থ সারাদিন অনেক ন্যায্য কারণ দেখিয়ে চিৎকার ক'রে তুলসীকে ডেকে ডেকে কেঁদেছিলেন। তুলসী আসেনি। কেবল, চণ্ডীচরণের চিৎকার বাইরে থেকে শোনা যাবে, সেই জন্যে সশব্দে দরজা টেনে, শিকল তুলে দিয়ে গিয়েছিল।

কেন, কিসের এত ঘৃণা ও রাগ তুলসীর এই বৃদ্ধ শিশু পণ্ডিতের ওপরে?

সেদিনও, মাথায় মাড় ঢেলে, ন্যায়-পরিহাসের পর, দু'চোখ ভরে ঘৃণার আগুন নিয়ে তাকিয়ে ছিল তুলসী। ভাতের ফ্যানকে দুধ মনে ক'রে তৃপ্ত হতে দেখে, তার বুঝি আফসোস হচ্ছিল। ভাবছিল, এ জড়পদার্থের ওপর ফ্যান ঢেলেও ক্ষতি। কিংবা, অতীতের সেই

বুদ্ধিমান নৈয়ায়িক, সব বুঝেও ছলনা করছে না তো তুলসীর সঙ্গে ? সে সন্দেহও ছিল যেন তুলসীর।

মুখ তুলে ডেকেছিলেন চণ্ডীচরণ, ‘চলে গেলি নাতবউ ?’

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল তুলসী।

ন্যায়তীর্থ ডাকছিলেন, ‘ও নাতবউ, আমাকে মুছিয়ে দিয়ে যা রে, গায়ে যে বড় চট্‌চট্ করছে।’

কিন্তু কোন সাড়া শব্দ ছিল না তুলসীর। সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল দাদাশ্বশুরের দিকে। তারপরে হঠাৎ বলেছিল, ‘জমিদারি প্রথা কিন্তু উচ্ছেদ হয়ে গেছে ঠাকুর্দা।’

ন্যায়তীর্থ চমকে উঠেছিলেন। শব্দ ক’রে উঠেছিলেন, ‘অ্যাঁ ?’

তুলসীর চোখ দপদপিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, ‘হ্যাঁ, খবরের কাগজে বেরিয়েছে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেছে। আপনার পাঁচগুলি পরগণার জমিদারির কি গতি হবে ?’

পরমুহূর্তেই কিন্তু চণ্ডীচরণ শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘ও, হ্যাঁ, শুনেছি ন’কড়ির মুখে। সে জন্যে আমার ভাবনা কিরে নাতবউ। পাঁচগুলিতে আমার কি আছে ? আমার তো জমিদারি নেই।’

তুলসী তীব্র গলায় বলেছিল, ‘তা নেই। কারণ, আপনিতো সবই ন’কু ঠাকুরপোকে দিয়ে গেছেন দানপত্র লিখে।’ বলে, ন্যায়তীর্থের মুখের প্রত্যেকটি ভাঁজ তীক্ষ্ণ চোখে দেখছিল তুলসী। চণ্ডীচরণ যেন শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কে বলেছে ? ন’কড়ি ?’

‘তা বলব কেন আপনাকে ?’

ক্ষণে মেঘ ক্ষণে রোদ নৈয়ায়িকের রেখাবহুল লোল মুখে। মুখের রেখা কাঁপিয়ে, আশ্বস্ত গলায় বলেছিলেন, ‘তুই একটা পাগল নাতবউ।’

তৎক্ষণাৎ সাপিনীর মত লকলকিয়ে উঠেছিল তুলসীর জিভ, ‘আমি পাগল না হলে, আপনি এ বুড়ো বয়সে এত চতুরালি খেলছেন কি করে ?’

চণ্ডীচরণ ভাঙা গলায় শীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন, 'হে নারায়ণ!'

তুলসী যেন উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল। তার তখনকার স্ফুরিত নাসারন্ধ্র, বহ্নিশিখা চোখ, আলুলায়িতপ্রায় পিঙ্গল চুল আর বসন-বিস্রস্ত অটুট উদ্ধত শরীরের দিকে তাকিয়ে কত পতঙ্গ পুড়ে মরতে পারত। দ্বিজপাড়ার যে পতঙ্গের দল, পঙ্গপালের মত ন্যায়তীর্থের বিশাল শরিকভাগ বাড়ির আনাচে-কানাচে বেড়ায় ঘুরে, পুড়ে মরবারই আশায়। কিন্তু নৈয়ায়িকের নোনা ইটের ভাঙা পাঁচিল তারা ডিঙোতে পারে না। তুলসীর ক্রুদ্ধকণ্ঠেও দীপক রাগিণীরই ঝঙ্কার। তাতে আগুন ঝলসে ওঠে। বলেছিল, 'আপনি মনে করেন, আমি কিছু বুঝিনে, না? আমার ছেলেপিলে হচ্ছে না দেখে, আপনার যে এত দুঃখু, তার কারণ আমি জানিনে ভেবেছেন, না? আমার ছেলেপিলে না হ'লে আপনি আমাকে কিছুই দেবেন না, জানি আমি, বুঝেছেন? জানি জানি জানি। ন'কু ঠাকুরপোর সঙ্গে দরজা বন্ধ ক'রে কি এত কথা হয় আপনাদের দুজনের?'

দুঃখে নয়, দারুণ ক্রোধেরই বাষ্পে গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল তুলসীর। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠেছিল তার উদ্ধত উত্তুঙ্গ বুক। সে মূর্তি বাঘিনীর চেয়েও যেন ভয়ংকরী।

ন্যায়তীর্থ যেন বিস্ময়ে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ছানি পড়া চোখের ঘষা ঘষা মণি দুটি যেন কোন্ সুদূরে নিবদ্ধ স্থির। শিথিল দড়ির মত তার নড়বড়ে গলার শিরগুলি, আর সারা মুখের রেখাগুলি কাঁপছিল থর্থর্ ক'রে। কিংবা বুঝি ভয় তাঁর সারা মুখে। বুঝি অনুভব করতে পারছিলেন তুলসীর ওই ভয়ংকরী মূর্তি। আশঙ্কা করছিলেন, বুঝি এই পুরনো অন্ধ কুঠরী ঘরটায় তাঁর ওপর তুলসী ঝাঁপিয়ে প'ড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে তাঁকে। ছিঁড়বে তার শাস্ত্র সুলক্ষণ চাকচিক্যশালী দাঁতে, রক্তাভ নখরে।

তুলসী প্রায় চিৎকার ক'রে উঠেছিল, 'কি, কথা বলছেন না যে? কোন ন্যায় বুঝি যোগাচ্ছে না এখন মুখে?'

নৈয়ায়িকের ন্যায় বোধহয় বোধগম্য হচ্ছিল না। বলেছিলেন, 'হে

ভগবান! কি বলব রে নাতবউ, তুই বোকা।'

'হ্যাঁ, আমি বোকা। আর আপনার নাতি তো কবেই নিজের পরকাল ঝরঝরে ক'রে বসে আছে, তাই আপনি আমারও সর্বনাশ করতে চান। এ বয়সে আপনার কুষ্ঠ হবে, গলে গলে পড়বে, ব'লে রাখলাম।'

ন্যায়তীর্থ যেন ভয়ার্ত গোঙা গলায় চিৎকার করেছিলেন, 'হে পরমেশ্বর, হে জগৎপিতা 'রক্ষা কর, মুক্তি দাও। মুক্তি দাও।'

ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল তুলসী, 'মুক্তি? মুক্তি পাবেন আপনি? পান কত মুক্তি পাবেন।' ব'লে শিকল তুলে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে।

সম্পত্তি চায় তুলসী। স্বামী জগদীশের কাছে কিছুই চাওয়ার নেই তার। সবাই বলে ম্যাট্রিক পাসও নাকি করেনি জগদীশ। তবু, রাণীর বাজারের এক কারখানায় 'বাবুর' কাজ করে সে। বোধহয়, কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকেই, রক্তে প্রথম ঘূর্ণিলাগা আবর্তে কয়েক বছর ধরে হাবুডুবু খেয়ে, জগদীশ এখন অকাল বৃদ্ধ। রক্ত মাংসের এই অপরূপ রূপবতী তুলসীকে সে এখন অর্ধেক মানবী জ্ঞানেই বোধহয় লক্ষ্য করে। দুই চোখে অপরিসীম অক্ষম ক্ষুধা ও অশেষ বিস্ময় নিয়ে তুলসীর দিকে চেয়ে থাকা আর তুলসীর সঙ্গে এক ঘরে এক শয্যায় মরার মত শুয়ে থাকাটাই যেন ভাগ্যের হাতে আখেরি আত্মসমর্পণ। রাণীর বাজারের ইতিবৃত্তে, পারিবারিক যে ঐতিহ্য বহন করার কথা ছিল জগদীশের, তাতে নৈয়ায়িক না হোক, কলেজের অধ্যাপক, নিদেন স্কুলমাস্টারি করার মত দিগ্‌গজ হতে বাধা ছিল না।

কিন্তু আপত্তি ছিল রাণীর বাজারের বিধাতার। যাদের ধনের গরিমায় রাণীর বাজার কোন এক কালে গর্ব করেছে, মানের গৌরব এখনো একেবারে ধুয়ে যায়নি কালের জলে, তাদের দিকে অনেক বছর ধ'রে, রাণীর বাজারের বুক চেপে চেপে চলা, আদিম শ্বাপদ সর্বনাশটা থাবা বাড়িয়েছে।

কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি কখনও। গৃহস্থের বাড়ি ও

মন্দিরের পাশে পাশে থেকে, সেই সর্বনাশ অনেক প্রলোভন দেখিয়েছে, অনেক মাথা কুটেছে পরাজয়ের গ্লানিতে।

তারপর, ধন ও মানের গৌরব যখন ফোঁপড়া ঢেঁকি হতে বসেছে, সেই সময়, প্রাচীন বাড়িটার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে, দিশেহারা জগদীশ একটা পথ খুঁজে মরছিল। শরিকভাগ বাড়ির মধ্যে অনেক জগদীশ ছিল। ওপরে না হোক, ভিতরে ভিতরে তাদের, শতাব্দীকাল ধরে ক্ষয়ের মারটা দুর্বল করেছিল অনেকখানি। হারিয়ে যাওয়া ধনগৌরবের হাহাকার, আধুনিক কালে ন্যায় স্মৃতিতে বিতৃষ্ণা, এই দু'য়ে মিলে, একটি বদ্ধ জলা সৃষ্টি করেছিল জগদীশের সামনে। নীল রক্তে অনেক আগুন নিয়ে জগদীশ ঝুঁকে পড়ল রাণীর বাজারের সেই সর্বনাশেরই দিকে।

এক মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে শ্বাপদ থাবাটা জগদীশকে টেনে নিয়ে গেল তার আদিম কোটরে।

ন্যায়তীর্থ তখন স্থবিরত্বের পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পিতৃমাতৃহীন জগদীশকে বাঁধবার কেউ ছিল না।

দ্বিজপাড়ার নৈয়ায়িকের পৌত্র গেল রাণীর গলিতে। ফানুসের খেলা আর কোথায় এত ভাল জমে? রিক্ত জীবনের ঝংকার আর কোথায় বাজে এমন করে? পথভ্রষ্ট দিশেহারা রক্তধারা তো এখানেই চঞ্চল হয়। এই আবর্তেই প'চে গলে, লীলা সাঙ্গ করে।

গৌরব মরেও মরে না। ভাঙা জীর্ণ মন্দিরের ইঁট নিয়ে লোকে অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করে।

রাণীর গলিতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভাঙা মন্দিরের ইঁট পাওয়া গিয়েছে। দ্বিজপাড়ার ধনী ও মানী পণ্ডিতের নাতি এসেছে। হা'লের বাবুদের মত নিউকাটে ঝাঁটা বুলানো লুটনো কোঁচা না থাকতে পারে পণ্ডিতের নাতির। হাওয়াইয়ান সার্ট আর আমেরিকান পাতলুন না উঠতে পারে তার অঙ্গে। পণ্ডিতদের ট্যাকেতেই সোনা রূপো লাখ টাকা ঘোরে। নিতে হ'লে ওখান থেকেই খুলে নিতে হবে।

জগদীশের আশেপাশে কাছাকাছি একেবারে কিছুই ছিল না, তা

নয়। যা ছিল, সেটুকুও রাণীর গলিতে কিছু কম নয়। অতএব শ্বাপদ থাবাটা মায়া বিস্তার করল সন্তর্পণে, নিখুঁত ক'রে।

নিজের এন্‌তেজারিতে যে নগদ টাকাটা ছিল, সেটা ফুরোতে বেশিদিন সময় লাগল না।

ন্যায়তীর্থ পৌত্রকে ডেকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁর বিধবা মেয়ে ভবানী জবাব দিতেন, 'জগু তো এখনও বাড়ি ফেরেনি বাবা।'

নৈয়ায়িক কথা কম বলতেন। কিন্তু জগদী'শের এত বেশি বাড়ি না থাকার কথা শুনে শুনে, কপালে তাঁর চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছিল।

বুকের মধ্যে কাঁপছিল শুধু ভবানীর। কারণ তিনি তো স্থবির নন। চোখে ছানি পড়েনি। তিনি দু চোখ ভরা ভয় ও বিস্ময় নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র জগদীশকে দেখছিলেন।

ভবানী এসেছেন অল্পদিন। জগদী'শের মা মারা গিয়েছেন তাই আসতে হয়েছে। আবার জগদীশ বিয়ে করলেই তিনি চলে যাবেন।

চণ্ডীচরণের তিনি গলগ্রহ নন। সংসার চালাবার দেখবার কেউ নেই। তাই এসেছেন সংসার চালাতে।

তিনি শুধু জগদীশের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন না। নিজের একমাত্র ছেলে ন'কড়ির ভাবনা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। না, ন'কড়ি জগদী'শের দ্বারা রাণীর গলিতে যাবার প্রেরণা পাবে, সেকথা একবারও ভাবেন না ভবানী। তাঁর বিশ্বাস, ন'কড়ি সে স্তর পার হয়ে এসেছে। সে তো প'ড়ে পাওয়া ষোল আনা পায়নি। কানাকড়ি খুঁটে সে মানুষ হয়েছে। কিন্তু সংসার বড় বিচিত্র। একই বাড়িতে পৌত্র যখন মন্দ পথে যায়, দৌহিত্র তখন বিদ্বান সচ্চরিত্র হয়ে সেই বাড়িতেই বিরাজিত। এ যেন ভবানীরই অপরাধ।

কিন্তু দিনে রাত্রে ন্যায়তীর্থ যতই জগু জগু ক'রে ডাকেন, ভবানী ততই শঙ্কিত জবাব দেন, 'জগু এখনো বাড়ি ফেরেনি বাবা।'

নগদ টাকার পরেই, জগদীশের আপাত নিজস্ব টুকরোটাকরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী শুরু হল। চণ্ডীচরণ ন্যায়তীর্থের সবই তার প্রাপ্য। সুতরাং ভবিষ্যতে তার অভয় ছিল।

কিন্তু ভবানী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাপের কাছে সমস্ত কথা খুলে বললেন। ন্যায়তীর্থ অবাক হলেন না। এইটিই আশ্চর্য। মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি অত উতলা হ'য়ো না ভবো। মিছে ভয় পেও না। আমি সব বুঝতে পারছিলাম। তোর কোন দোষ নেই, তাও জানি। তুই তাড়াতাড়ি নকুকে বল্‌, বোস-পাড়ার অবনী উকিলকে সে যেন সন্ধ্যাবেলায় ডেকে নিয়ে আসে আমার কাছে। নকুও তখন থাকবে আমার কাছে।'

'বাবা!'

মেয়ের কণ্ঠস্বরে চমকেই উঠেছিলেন নৈয়ায়িক। বলেছিলেন, হেসে ফোগলা মাড়ি বার ক'রে বলেছিলেন, 'ভয় নেই ভবো। তুমি ভাবছ, জগদীশকে না দিয়ে, আমি আমার সব কিছু নকুকে দিয়ে যাব? তাতে লোকে তোমাকে কলঙ্ক দেবে বাপকে দিয়ে তুমি নিজের ছেলের নামে সবকিছু করে দিয়েছ, এসব কথা তোমাকে শুনতে হবে ভাবছ? সে ভয় করো না ভবো। আমি কখনো পাপ করিনি, করব না। যা করব, তা ন্যায় ছাড়া অন্যায় হবে না। পরে জানতে পারবি।'

কী করেছেন ন্যায়তীর্থ, কে জানে। কিন্তু জগদীশ ফিরে এসেছিল রাণীর গলি থেকে।

রাণীর বাজারে রাণীর ঋণ শোধ ক'রে যখন শেষবারের জন্য ঘরে ফিরে এল নৈয়ায়িকের বংশধর, নিয়তির কাছে সে তখন নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে।

একবার বুঝি ন্যায়তীর্থের যৌবনের কঠোরতা ফিরে এসেছিল। বাক্যালাপ ছিল না আর জগদীশের সঙ্গে। ভবানীকে ডেকে বলেছিলেন, 'জগুকে বাড়ি ছাড়া করব না। কিন্তু ওর জন্য যেন রান্না না হয় এ বাড়িতে।'

সেটা ভবানী এমনিও পারবে না, জানতেন ন্যায়তীর্থ। কিন্তু ভাবনী অন্য কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'কিন্তু বাবা, জগু বড় অসুস্থ, তাকে একটু ডাক্তার দেখানো দরকার।'

চণ্ডীচরণ বলেছিলেন, 'পাপের চিকিৎসা আমার পয়সায়! এ

বাড়িতে হবে না ভবো। জগুকে জানিয়ে দিও।'

ভবানী কিন্তু ছাড়েননি। বলেছিলেন, 'এ তো তোমার ঠিক কথা নয় বাবা।'

'কেন?'

'এ বাড়ির পুরুষেরা অনেকের অনেক পাপ দূর করেছেন। অনেকের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়েছেন। সব পাপ তো এক রকম নয়। এক এক পাপের এক এক রকম চিকিৎসা। তোমরা আশীর্বাদ করো। জগুকে বাঁচাও বাবা। নইলে সে মরে যাবে।'

নৈয়ায়িকের গলার স্বর ভেঙে এসেছিল। বলেছিলেন, 'এসব কথা তোকে বুঝি নকু শিখিয়েছে?'

'কেন বাবা? আমি কার মেয়ে, সেটা একবার ভেবে দেখবে না?'

ন্যায়তীর্থ দু'হাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আর ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'মা আমার! তুই জগুর ভগবতী। তোর কল্যাণে সে বাঁচবে।' তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেছিলেন, 'চিকিৎসা কর। তারপরে ওকে একটা রোজগারের রাস্তা দেখতে বল।'

চিকিৎসা হয়েছিল। প্রাণে বেঁচেছিল জগদীশ। কিন্তু আসলে, ন্যায়তীর্থের স্থবিরত্বের সঙ্গে তার কোন তফাত রইল না। জরা নিয়ে সে যৌবনের ছদ্মবেশ পরে রইল। তারপরে চটকলে চাকরি পেয়েছে। সেটাও বোধহয়, বংশগৌরবেই। কারণ রাণীর বাজারের চটকলে রাণীর বাজারের লোকেরাই কাজ করে, তারা চেনে জগদীশকে।

কিন্তু ন্যায়তীর্থ যেটা সবচেয়ে বড় ভুল করেছেন, সেটা হল, পৌত্রকে বিয়ে দিয়ে নতুন ক'রে ঘরে বাঁধবার পরিকল্পনা। ভুল ঠিকই, তবু জীবনের শেষে আর একমাত্র সাধ তো ওইটুকুই ছিল। বংশরক্ষাকে যে তিনি পরম ধর্ম ব'লে জানেন।

তাই জ্যোতিষশাস্ত্রীর মেয়ে এল। তার হাতে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে, ভবানী ছেলে নিয়ে পালালেন। পালিয়ে বাঁচলেন। যদিও মৃত স্বামীর সামান্য ক্ষুদকুড়ো নিঃশেষ ক'রে, শিকড় গাড়লেন এই রাণীর বাজারেই।

দরিদ্র মা আর দরিদ্র সন্তান। রাণীর বাজারের পাপের চোখ ধাঁধাঁনি আলোয় যে অশেষ পুণ্যকে চোখে পড়ে না, সেইখানে তাদের বাস।

এল তুলসী। কিন্তু ন্যায়তীর্থের সঙ্গে নাতির মুখ দেখাদেখি, বাক্যালাপ বন্ধ হয়েছে অনেকদিন। সেই অবস্থা আজকেও আছে। জগদীশ ভুলেও কখনো চণ্ডীচরণের ঘরে আসে না। চণ্ডীচরণও কখনো জগদীশের খোঁজ খবর নেন না। মাঝখানে পড়েছে তুলসী।

তর্করত্ন জ্যাঠা আর ন্যায়তীর্থ দাদাশ্বশুরের কাছে যে সব শাস্ত্রে তুলসী কিছু অধিকার পেয়েছে, জীবনে তা কোনদিন কাজে লাগবে কি না কে জানে। কিন্তু আর দশটি সাধারণ মেয়েদের মতই তৈরী হয়েছে তুলসী। বিয়েকে সে বিয়ের মতই দেখেছে। যে বিয়ে স্বপ্নের মত, স্বর্গের মত। রক্ত আর জীবনের আশৈশবের নিংড়ানো রস দিয়ে লালিত সেই বিয়ে। সে পুরুষ চেয়েছে। কালিদাসের মত কবি, ধূর্জটির মত বীর সেই পুরুষ। ঐশ্বর্য চেয়েছে কুবেরের ভাণ্ডারের মত। কিন্তু সে তো হাস্যকর চাওয়া। তাই আর দশজনের মত, তার 'কিছুমিছু' তো পাবে।

কিন্তু কোনটাই জোটেনি কপালে। তার চিরসাধের রাত্রিতে, চিরবাসনার শুভরাত্রিতে সে পেয়েছিল এক নখদন্তহীন পুরুষ। শুধু চেহারায়। আর কিছু নয়। সে মানুষ কি না, সেটাও প্রশ্ন ছিল তুলসীর।

স্বামী লম্পট হয়। এই সমাজে যাকে লাম্পট্য বলা হয়, সেই রকম। তবু লাম্পট্যের সঙ্গে গুণ রূপ বুদ্ধি ঘৃণা ভালোবাসা দিয়ে সংগ্রাম করা যায়। জগদীশ লম্পটও নেই আর। ওইতেই সে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে এসেছে। তুলসী যাকে পেয়েছে, তাকে জীবজগতে ফেলা যাবে কি না তাতেও সন্দেহ।

তুলসী দেখেছে, বৈদিকপাড়া থেকে যেদিন সে প্রথম রাণীর বাজারের নৈয়ায়িকের ঘরে এসেছে, সেইদিন থেকেই জগদীশের কাছে তার কিছু চাওয়ার নেই।

কিন্তু জগদীশ যে ভাবে তুলসীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এমনি আত্মসমর্পণের মূলে যে কলকাঠিটা দিবানিশি মনের গলিতে গলিতে কুটুর কুটুর করে, সেটা হল সন্দেহ। তুলসীর দিকে চেয়ে থাকা তার অক্ষম চোখ ক্রমেই বড় আর অপলক হয়ে উঠেছে। দেহের কোষে কোষে তার যত রক্ত, সব জমা হয়েছে দু'চোখে।

যেখানে সন্দেহ, সেখানেই ঘৃণা।

কিন্তু সে অধিকার তুলসীর যদিও বা ছিল, জগদীশের নেই। তার সম্বল শুধু ভয়। তুলসীর সূর্যচ্ছটা রূপ শুধু অর্ধেক মানবী নয়, একটি অলৌকিক ভয়ও যেন জগদীশকে গ্রাস করে রেখেছে।

ন্যায়তীর্থের কাছেও তুলসীর চাওয়ার কিছু থাকত না, যদি শরিকানার চোরা দেউড়ি পার হয়ে টিকটিকির মত কেউ তাকে টুকে দিয়ে না যেত যে, বুড়ো তাকেও নাকি ফাঁকি দেবেন। এখনো যা আছে, তুলসী যদি পায়, তবে তুলসীর আখেরের ভাবনা থাকবে না। কিন্তু বুড়োর নাকি মতলব সুবিধের নয়। তিনি তাঁর সবকিছুই নাকি তুলসীর পিসীশাশুড়ির ছেলে, ন'কড়িকে দিয়ে যাবার মনস্থ করেছেন। তাই ন'কড়ির এত আনাগোনা, বন্ধ-দরজা ঘরে দাদুর সঙ্গে ন'কড়ির চুপি চুপি এত কথা। যদি তুলসীর সন্তান হত, তবু নাকি একটি রাস্তা খোলা থাকত। কিন্তু সে আশা কোনদিন মিটবে না তার।

অতএব ?

নতুন নাতবউ নম্রলজ্জাবতী তুলসী দেখল তারই চার পাশে ঋণীদের ভিড়, কেউ তার প্রাপ্য মেটাতে চায় না। আমি আমার চিলেকোঠা থেকে দেখলাম, তুলসীর দু'কূলপ্লাবী রূপ ও যৌবনে একটি মহাপ্রলয়ের বাসনা পাক দিয়ে ফিরছে। ভয়ংকরী সর্বনাশের প্রতীক্ষা তার সর্বসুলক্ষণযুক্তা নিটুট অঙ্গে অঙ্গে।

আমি সভয়ে দেখেছি, যদিও তুলসীর সুঠাম পায়ের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি নিপাটে চেপে বসছে মাটিতে, তবু নৈয়ায়িকের সদর দেউড়ি খোলা পড়ে আছে। অলক্ষ্মীর হাতছানি সেখানে আছে অষ্টপ্রহর।

তুলসীর নীলদ্যুতি বিশাল চোখ অনেকবার সেই হাতছানি দেখেছে

চেয়ে চেয়ে। যত দেখেছে, ততই প্রবল ঘৃণায় ও রাগে, ফিরে এসেছে সে ন্যায়তীর্থের ঘরে। অন্ধ আক্রোশে, নতুন নতুন পীড়নের পন্থা খুঁজেছে সর্বনাশীর মত। নৈয়ায়িক বাড়ি নিরামিষাশী নয়। এ বাড়ির মস্ত বড় তীক্ষ্ণ আঁশবঁটির ধার চকচকিয়ে উঠেছে তুলসীর চোখে।

ন্যায়তীর্থের দেহ জুড়ে যত কালের গভীর রেখা সেই প্রতিটি রেখা শুধু ষড়যন্ত্রের জটিল লেখা ব'লে মনে হয়েছে তার। সে জটিল লেখা ভেদ ক'রে সম্পত্তি আদায় করতে চেয়েছে তুলসী।

কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র। মন বিচিত্রতর। ফাঁকিতে না পড়ার বাসনায় তুলসী যতই ভয়ংকরী, ততই জীবনের আর একটি জটিলতা জড়িয়ে বেঁধে মারছে তাকে। সেই মারটাই বুঝি তুলসীর নিজেরও বিস্ময়। সবচেয়ে বেশী যাকে ঘৃণা করার কথা, সেই সম্পত্তির দাবীদার ন'কড়িকে দেখলেই, তুলসীর সব সুলক্ষণগুলি যেন শাস্ত্রসম্মতভাবেই ফুটে ওঠে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ন'কড়ি। গরীব বিধবা মায়ের খুদ-সেদ্ধ খেয়েও কপালে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়তিলক আঁকা। নম্র, অমায়িক কিন্তু কী একটা দৃঢ় কঠিন মানুষ ঢাকা পড়ে থাকে তার অতি সাধারণ বেশভূষায়। মুগ্ধ হতে যার বাঁধে না, কিন্তু বিমুখ করতেও আটকায় না যার, তেমনি আলো-আঁধারের রহস্যের মত পুরুষ ন'কড়ি তুলসীর কাছে।

মহকুমার সংক্ষিপ্ততম শহর রাণীর বাজারের রাজনীতিতে ন'কড়ির বড় রকমের শরিকানা আছে। তাই সে চিরকালের বেকার। ছাত্র পড়িয়ে তাকে খেতে হয়।

নিজের ভরণপোষণ শুধু নয়, মায়েরও। কারণ রাজনীতির পরিচালনা ভাগের যে-অংশে সে স্বেচ্ছায় গিয়েছে, সে অংশকে আধুনিক ভাষায় 'নীচুতলা' বলা হয়। সেখানে যে নামহীন অগণিতদের ভিড়, আদিকাল থেকে তাদের নাম ছিল উলুখাগড়া। তারা তাদের জন্মাবার কারণ জানত না। মৃত্যুর হেতু অজানা ছিল। যুগে যুগে তারা দেখেছিল, তারা জন্মায়, শ্রম করে, বাসা বাঁধে, আহার সংগ্রহ করে, মৈথুনে লিপ্ত

হয়। সন্তান উৎপাদন করে। তারপর একদিন রাজারা লড়ে, আগুন লাগে, উলুখাগড়ারা উৎসন্নে যায়।

যে-দিন থেকে জীবনমৃত্যুর এই অজানা কারণের উৎস সন্ধানে যাত্রা করছে তারা, সেই দিন থেকে তাদের নাম হয়েছে জনতা। নীচুতলার জনতা। গন্তব্যের একটি নিশানা তারা পেয়েছে। গন্তব্যস্থলের নাম, 'মানুষের মত বাঁচবার অধিকার'। কিন্তু সেখানে যেতে হলে বিস্তর বাধা। কারণ, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার তাদের নেই। সেইজন্যে আইন, আইন রক্ষার্থে সশস্ত্র শক্তি এবং মাদুলি কবচ বশীকরণ জাতীয় কিছু অলৌকিক পরিকল্পনা, বাণী ও প্রতিনিধি সভা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।

এইসব বাধা যদি ওরা ডিঙোতে চায়, তা হ'লে তাদের বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হবে। আর বিদ্রোহী হলে তখন 'মানুষের মত', নয়, 'তার বাঁচবার' অধিকার-ই ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

নীচুতলায় আজ সেই বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাচ্ছে। ন'কড়ির কাছে সব দরজাই সেজন্য বন্ধ।

শুধু যে সব অনিশ্চিত অবহেলিত দরজাগুলিতে আইন লটকানো নেই, তারই অন্যতম, প্রাইভেটে ছাত্র পড়ানো।

ওপর তলার নীলামের বাজারে, চড়া দামে বিকোবার ডাক ছিল ন'কড়ির। কিন্তু ন'কড়ির পা দুটিতে শক্তি ছিল। সে ওই ডাকের মুখে শক্ত পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। তাই সে দুর্বিনীত বলে আখ্যাত সেই সমাজে, যারা মনে করেছে, ন'কড়ির সবটাই দারিদ্র্যের আস্ফালন।

দুঃখ ও অনিশ্চিত জীবনের সব সময়ে দুটি পরিণতি আছে। একটি হল, সংসার মন্দ। মন্দ না হ'লে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করা যায় না। দূর হয় না দুঃখ। আর একটি, সংসারে ভাল আছে, মন্দও আছে। এ দুয়ের দ্বন্দ্ব দিবানিশি। এ দুয়ের টানাপোড়েনে মানুষ ক্ষতবিক্ষত। সেইটাই মানুষের আসল রূপ।

জীবনে যাদের এ টানাপোড়েন নেই, এ জঙ্গম পৃথিবীতে তারা স্থাণু।

কিন্তু এ অনুভূতি মানুষ নিয়ত অনুশীলন ক'রে বেড়ায় না। জীবন-ধারণের প্রকৃতি তাকে গড়ে তোলে। বাতাস আছে, দেহের প্রতি রোমকূপে তাকে অনুভব করা যায়। কিন্তু দেখা যায় না। এ অনুভূতি সেই রকম। কারণ বিবেক বাতাসের মত।

ন'কড়িরও সেই রকম। পুরোপুরি জেনে আর ভেবে নয়, সংসারের ভাল আর মন্দের নিরন্তর দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পথেরই শরিক সে শৈশব থেকে। বড় হয়ে যখন সেই ভাল মন্দের অর্থ সন্ধানী হয়ে উঠল মন, তখন সমস্যাটা দেখা দিল জীবন নিয়ে। এ জীবন নিয়ে কী করা যায়? যা ফাঁকি মনে হয়, মন্দ লাগে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়। কিন্তু কতটুকু করা যায়, প্রতিদিনের জীবনে সেইটিই নিয়ত প্রত্যক্ষের বিষয়।

কোনো উপদেশ নির্দেশের দিবানিশি বেড়াজালে মানুষ হয়নি ন'কড়ি। দরিদ্র, কিন্তু নিষ্ঠা নিরহঙ্কার প্রসন্নতার মধ্যে দিন কেটেছে তার।

দক্ষিণ বাংলার নীচুতে এক বৈদিক পরিবারে তার জন্ম। জ্ঞান হয়ে সে দেখেছে, তার বাবা মা দু'জনেই বেশ বয়স্ক। আঁতুড়ে এক দিদি, দু' বছর বয়সে এক দাদা মারা গিয়েছিল। ন'কড়ি ছিল শেষতম সন্তান। যাকে ন'টি কড়ি দিয়ে, দেবতা নয়, বোধহয় শমনের হাত থেকেই কিনতে হয়েছিল। কিন্তু ন'কড়ির বাবা কোনদিন ছেলেকে ন'কড়ি বলে ডাকতেন না। তিনি ডাকতেন ধ্রুব বলে।

বাবা মা দু'জনকেই ভালবাসত ন'কড়ি। কারণ, বাবা মা, পরস্পরকে যে নিবিড়ভাবে ভালবাসে, এটা সে দেখেছিল। সংসারে আর মানুষ ছিল না। বিহঙ্গ-বিহঙ্গীর কূজন যদি কোথাও থাকে সে তাদের নিজেদের ঘরে। সে ঘরে কোনদিন উচ্ছল খিলখিল হাসি শোনা যায়নি মেয়ে গলায়। পুরুষের উল্লসিত আবেগ উচ্চ গলা কোনো কলরবে ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নিঃশব্দে, নীরব হাসি ও চোখে চোখে কথায় দুটি হৃদয়ের মিলিত মোহনায় যে কত উচ্ছ্বাস, কত বিচিত্র কলরোল, ন'কড়ির শিশু চোখে ও মনে কিছুই অজানা থাকেনি।

সকলের আড়ালে বাবা মাকে ডাকত 'ভবন' ব'লে। সে গম্ভীর

মিষ্টি ডাকের মধ্যে এমন একটি সুর বেজে উঠত যেন, আপনা থেকেই সহসা সমস্ত প্রাণে একটি নিঃশব্দ প্লাবন হয়ে যেত।

মাঝে মাঝে মেঘ ঘনিয়ে আসত সেই ছোট সংসারে। কাকা জ্যাঠারাই সে মেঘ নিয়ে আসতেন। বছরে একবার কি দুবার বাবাকে নানান রকম নোটিশ, কোর্টের চিঠি পেতে হ'ত। সেগুলি আর কিছুই নয়, বাবা যে ক্রমেই নিঃস্ব হচ্ছে, জমিজমা সব কিছুই শেষ পর্যন্ত কাকা-জ্যাঠাদের ভোগে চলে যাচ্ছে, সে সব জানানো হ'ত। ন'কড়ি জানত, ব্যাপারগুলি ঘটাচ্ছেন কাকা-জ্যাঠারাই। বাবাকে ফাঁকি দিতে চান ওঁরা। কিন্তু বাবা সেগুলি চেয়েও দেখতেন না। খেতের ধান যেটুকু পেতেন তার হিসেবনিকেশ করতেন না কোনদিন। ঠাকুরবাড়ি নামে গ্রামে যে বড় বাড়িটি ছিল, সেখানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থায় যে টোল চলত, তাতে শিক্ষকতা নিয়েই থাকতেন।

কিন্তু মায়ের মন মানত না। ভবানী উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হতেন। ন'কড়িরও ভীষণ অপমান আর রাগ হত মনে মনে।

ন'কড়ি দেখেছে, তার সামনেই বাবা মায়ের মাথায় আশীর্বাদের মত একটি হাত রেখে, আর এক হাতে মায়ের চিবুকটি তুলে ধরে বলতেন, 'ভবন, কেন মন খারাপ করছ! যে-কাজ আমি করতে পারব না, সংসারে তার ফল ভোগও আমার জুটবে না। দাদা কিংবা ব্রজেন যে-সব কাজ করছে, তাতে জমিজমা সম্পত্তি ওদেরই প্রাপ্য। ওরা ওসব নিয়ে ভাবে, খাটে, ছুটোছুটি করে, কোর্টে যায়, উকিল ধরে, খরচও করে। সম্পত্তি রাখতে ও করতে গেলে, ওসবের প্রয়োজন আছে। আমি সে সব কিছুই করিনে, আমার কিসের দাবী? রক্তের সূত্রে আমার অনেক পাওনা। দাদারা সে সব আমাকে দিতে চান না। না-ই দিলেন। সংসারের ধর্মের সূত্রে আমার যা পাওনা, তাতে ফাঁকিতে না পড়লেই হল। আমি ওরকম হ'তে পারিনে, তাতে তুমি রাগ করছ কেন?'

মায়ের চোখে তখন জল এসে পড়ত। বলতেন, 'আহা, আমি কি তোমার জন্যে রাগ করেছি নাকি? কিন্তু ন্যায্য পাওনা এমন করে

'কেড়ে নিলে রাগ হয় না ? কষ্ট হয় না বুঝি ? ন'কড়িটার কি হবে ?'

বাবা হাসতেন। বলতেন, 'ধ্রুব কি তার ঠাকুর্দার সঞ্চিত সম্পত্তির আশায় সংসারে এসেছে ? ভবন, তুমি এক এক সময় বড় ছেলেমানুষ হয়ে পড়, তোমার আমার বাসনা ধ্রুব। সে বাসনাকে লালনপালন বড় করা, সে সব আমাদেরই। গরীবের ছেলে গরীবের মতই মানুষ হবে। চোখের জল মোছ ভবন।'

ভবানী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতেন। বাবা তখন ডাকতেন ন'কড়িকে, 'ধ্রুব, এদিকে এস।'

ন'কড়ি কাছে আসত। বাবা তাকে এবং মাকে দুজনাকেই বুকের কাছে টেনে নিতেন। বলতেন, 'ভবন, জীবনে ভয় অনেক সৃষ্টি করা যায়। অবিচলিত থাকতে পারা তার চেয়ে অনেক ভাল। তাতে নিজের ভয় যায়, অপরেও একটু নিশ্চিন্ত হয়।'

ন'কড়িকে বলতেন, 'ধ্রুব, মায়ের কাছে এখন থাক, গল্প কর, মায়ের কাজ করে দাও।'

এমনি ছিলেন বাবা আর মা। মার প্রধান গল্প ছিল, তাঁর নিজের বাবা সম্পর্কে। অর্থাৎ চণ্ডীচরণ ন্যায়তীর্থের সম্পর্কে। ন'কড়ি জানত, রাণীর বাজারের দেশবিখ্যাত পণ্ডিত চণ্ডীচরণ ন্যায়তীর্থের সে দৌহিত্র। জানত শুধু নয়, অনেকবার রাণীর বাজারে এসেছে, দেখেছে চণ্ডীচরণকে। ন্যায়তীর্থ ন'কড়িকে কেবল তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আর ন'কড়িকে বলতেন, 'তোমার বাবা একজন মস্ত বড় মানুষ, এটা জানবে। খবরদার, কখনো তাঁর কথার অবাধ্য হবে না। আমাদের চেয়েও তিনি অনেক বড়।'

সেইজন্য দাদুকেও ন'কড়ির খুব ভাল লাগত। শুধু একটি কথাই বুঝত না। ভাবত, দাদুর নাকি অনেক বিষয়সম্পত্তি। কিন্তু ন'কড়িদের এত কষ্ট, কই দাদু তো কখনো তাদের কিছু দেয় না।

ছেলেমানুষ ন'কড়ি জানত না, তার মা কখনো তা নেবেন না। দাদু দিতে চাইলে মা বরং কষ্টই পাবেন।

বাবা মারা যাবার পর সেখানে থাকা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। ন'কড়ি

তখনো ছোট। সবে কলেজে ঢুকতে যাচ্ছে। শুধু অসহায়বোধ করেই মা রাণীর বাজারে চলে এসেছিলেন। দাহু যেন তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলেন মায়ের কাছে। রাণীর বাজারেরই উত্তরাঞ্চলে ভবানীর নামে ছোট পুরনো একটি বাড়ি রেখেছিলেন নৈয়ায়িক। সেই বাড়িই আশ্রয় হয়েছিল। আজও সেখানেই আছে ন'কড়িরা।

এই পরিবেশের মধ্যে কোথায় বস্তুবাদী রাজনীতির জড় লুকিয়েছিল সেইটি বড় বিস্ময়। বাবা মা কিংবা দাহু, তাঁরা সকলেই ধার্মিক। স্নিগ্ধ স্নেহময় মানুষ। তার মধ্যে বাবা ছিলেন বিশেষ করে সত্যবাদী, নির্ভীক। তবু সেখানে ভাববাদেরই লীলা। লোকায়তিক ধ্যানধারণার ছায়া সেখানে কবে থেকে কেমন করে পড়েছিল, ন'কড়িও জানত না। বোধহয়, নিষ্ক্রিয় কল্যাণ কামনা যে কোনো কাজের কথা নয়, একথা উদয় হয়েছিল নকড়ির মনে। উদয় হয়েছিল ইতিহাস পড়তে গিয়ে। ইতিহাসেই এম. এ. পাস করেছে সে।

আমি আবার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে প্রথম যেদিন দেখলাম, বিধবা ভবানীর হাত ধরে ন'কড়ি এসে উঠল রাণীর বাজারে, সেদিন রাণীর বাজারের আকাশে, দলা দলা কালো মেঘ ছিঁড়ে একটি নীল স্থিরত্যুতি তীরের মত উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটে চলেছে। সেটা উল্কা নয়, বিদ্যুৎ নয়। কালো মেঘের মধ্যে সহসা ফেটে বেরিয়ে পড়া স্নিগ্ধ নীল আকাশের ফালিটাকে অমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

আমি দেখলাম, সদ্য বিধবাবেশিনী ভবানী, আর মুণ্ডিতমস্তক রোগা ফর্সা ন'কড়ি। দুটি বড় বড় চোখে তার পিতৃবিয়োগের ব্যথা ও নতুন জীবনের কৌতূহল। কেন যেন আমার চোখে সেদিন সন্ন্যাস ব্রতধারী নিমাইয়ের কথা মনে পড়ল। ভবানীকে মনে হল শচীদেবী।

রাণীর বাজারের স্টেশনে প্রত্যহের মতই দাঁড়িয়েছিল বিছে পাগলা। যাকে ডিঙিয়ে রাণীর বাজারের স্টেশনে, চেনা অচেনা কোনো যাত্রাই যেতে পারবে না। ভিক্ষ চাওয়ার সুর তার গলায় থাকে না। মুখ করুণ করে হাত পেতে দাঁড়ায় না সে। বলে, 'টিকিট বাবুকে টিকিট না দিলে বোত নী পেরুতে পার না। আর বিছের বেলায়

লবডঙ্কা। সেটি হবে না। দু'চার প'সা ছেড়ে যাও দিনি বাবা।'

অন্যথায় বিছেকে ছাড়ানো মুশকিল। বিছেকে লোকে বলে পাগলা। রাণীর বাজারের লোকেরা এই পৃথিবী নামক গ্রহেরই জীব। সুতরাং আর সকলের মত, তারাও একবার একটি কথা একজনের সম্পর্কে শুনলে, বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হয়। বিছেকে পাগল ভেবে আর নিজেদের সুস্থ ভেবে আছে তারা বহাল তবিয়তে।

আমি যেন দেখেছি, মহাকালের নির্দেশে, পাগলের বেশ ধরে রাণীর বাজারের মানুষদের বিছে খুব এক চোট বিদ্রূপ ক'রে নিচ্ছে।

বিছের আছে অনেক কথা। তাই এখন থাক। যে কথা বলছিলাম আমি দেখলাম, বিছে সরাসরি ন কড়ির চিবুক ধরে, আদর ক'রে বলল, 'এয়েছ আমার চাঁদ। এস। পকেটে প'সা নেই তো খোকনের? যাও, ছেড়ে দিলুম। পরে মিটিয়ে দিও।'

আমি দেখলাম, রাণীর বাজারের সেই সর্বনেশে লড়িয়ে ষণ্ডটা দাঁড়িয়ে স্টেশন ও রাস্তার প্রাঙ্গণে। ভয়ে সেখানে লোকজন নেই কাছাকাছি। ন'কড়ি মায়ের সঙ্গে তার পাশ দিয়ে গেল খুনী শিং জোড়া ছুঁয়ে। ষণ্ড মাথা নামিয়ে নিল। শুধু চিৎকার করা সার হল লোকের, 'মারলে, মারলে গুঁতো।'

আমি দেখলাম, রাণীর বাজারের পথিক আর দোকানীরা বারেক না তাকিয়ে পারেনি সেই মা ও ছেলের দিকে।

সেই থেকে রাণীর বাজারে ন'কড়ির জীবন শুরু।

বিয়ের কোলাহলে ভিড়ে, ন'কড়িকে তুলসী যেন দেখেও দেখেনি। চিনেও চিনতে পারেনি। অনেকের মধ্যে খুঁজে পায়নি। কোলাহল শুধু বিয়েবাড়িতে নয়। তার বুকের মধ্যেও ছিল। বুকের মধ্যে অনেক মানুষেরও ভিড় ছিল তার।

সেই কোলাহল ও ভিড় কেটেছিল ফুলশয্যা রাত্রেই। নিঃশব্দ স্তব্ধ বুক নিয়ে তুলসী বাপের বাড়ি গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখেছিল, পিসিশাশুড়ি নেই। সংসার তুলসীর।

সেই নিঃশব্দ স্তব্ধতার মধ্যে ন'কড়িকে প্রথম যেদিন এই পুরনো বাড়িটা কাঁপিয়ে ঢুকতে দেখেছিল তুলসী, বাড়িটার মত তারও বুকের মধ্যে কেঁপেছিল। তার সমস্ত স্তব্ধতা খান খান হয়ে গিয়েছিল ভেঙে। ঘোমটা টেনে সে কূল পায়নি।

তারপর লজ্জা কাটিয়ে প্রথম যেদিন তাকিয়েছিল ন'কড়ির চোখের দিকে, সেইদিন থেকে তার চোখের পাতায় বিচিত্র ব্রীড়া একই রয়ে গিয়েছে। বুকের কাঁপুনিটা বন্ধ হয়নি কোনদিন। যে জোয়ার তার শরীরের কূলে কূলে মাথা কুটে মরে, ন'কড়ির সামনে যেন সেই আবর্ত সহসা একটি গতি পেয়ে, হারিয়ে যাবার বাসনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সে শান্ত হয়, হাসে, জল গড়িয়ে দেয়, কথা বলে।

আমি আমার চিলেকোঠা থেকে দেখেছি, ন'কড়ির সামনে তুলসী নিজের রক্ত কোষে কোষে, তার সন্তানের কান্না শুনতে পায়। তার মাতৃত্বের হাহাকার ব্যথিত চোখ, ন'কড়ির সর্বাঙ্গে, তার পায়ে, মাথা কুটে মরে।

কিন্তু তুলসীর মনে হয়, ন'কড়ির টানা টানা চোখ দুটিতে যেন আলো আঁধারের খেলা। হাসিতেও তার রহস্য। কথায় তার আড়ষ্টতা নেই, রসিকতা যেন ইঙ্গিতময়। কিন্তু যখন সে চলে যায় কেমন করে যেন সব ইঙ্গিতের বাষ্প যায় উপে।

তখন মনে হয়, ন'কড়ির সব ইঙ্গিত, সব হাসিটুকু যেন বন্ধ দরজা-ঘরের গুপ্ত আলোচনারই একটি অঙ্গ। তুলসীরই সর্বনাশের ছলনার রহস্য নিশ্চয় ন'কড়ির চোখে।

ন'কড়ি এসে যখন ঠাট্টা ক'রে বলে, 'এ-বাড়িটাতে, একলা ওই বুড়োমানুষটাকে নিয়ে থাকতে তোমার ভয় করে না বউদি?'

তখন তুলসী জবাব দেয়, 'ভয় করলেই বা আমার এ-ঘরে এসে সাহস দেবে কে ঠাকুরপো?'

তুলসীর দু'চোখের দিকে তাকিয়ে, ন'কড়ি হঠাৎ যেন চমকায়। বলে, 'তোমাকে সাহস দেবার দরকার নেই অবশ্য, বরং, তোমাকেই যেন ভয় করে।'

'আমাকে ? কেন ঠাকুরপো ?'

হেসে বলে ন'কড়ি, 'আয়নায় একবার নিজেকে দেখ।'

কথায় কথায় নিশিতে পায় তুলসীকে। বলে, 'সারাদিনই তো দেখি, কই আমার ভয় করে না তো ?'

'ভাল ক'রে দেখনি বোধ হয়।'

'দেখেছি ঠাকুরপো। কিন্তু, সে পারা লাগানো কাঁচ, তোমার চোখ তো নয়।'

অট্টহাসিতেও বুঝি ন'কড়ির জুড়ি মেলা ভার। বলে, 'ওরে বাবা, বউদি, তুমি বোধ হয় রাগ করেছ।'

'না।'

'তবে ?'

তুলসী তার বিশাল চোখ দুটি নিয়ে আর তাকিয়ে থাকতে পারেনি ন'কড়ির দিকে। চোখ নামিয়ে বলে, 'শুধু ভয় পাও ঠাকুরপো, তাই ভাবি।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আমারও যে কত ভয় করে ঠাকুরপো।' চোখ তুলে দেখে, ন'কড়ি তখন তার দাদুর ঘরে দরজা বন্ধ করেছে। যেন, শুধুই ভোলানো, শুধুই ছলনা তুলসীকে। বন্ধ দরজাটার গায়ে যেন তুলসীর বঞ্চনার অলিখিত ষড়যন্ত্র কাহিনী লেখা হ'তে থাকে। অসহ্য ঘৃণায় ও রাগে, বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে তুলসী। যত খাতকের দল নানান বেশে ঘিরে থাকে তাকে, কিন্তু কেউ দেনা মেটায় না।

তবু যতক্ষণ অদর্শনেও ন'কড়ির অবস্থিতি থাকে এ বাড়িতে, ততক্ষণ ধরেই কী একটি সুর যেন বাজতে থাকে ঘরে ঘরে সিঁড়িতে বারান্দায় দালানে। কাজ প'ড়ে থাকে। দাউ দাউ ক'রে উনুনটা জ্বলতে থাকে, বোধহয় তুলসীর বুকেরই মত। জ্বলতে থাকে, জ্বলতেই থাকে অবহেলায় ও অকাজে। কেউ ফিরেও তাকায় না!

ঘরে যায় তুলসী। সত্যি সত্যি গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। পারা লাগানো কাঁচ, নাম তার আয়না। তুলসী প্রতিবিম্ব দেখে,

চোখে তার ঈষৎ রক্তাভা। ঠোঁট যেন সদ্য-দংশিত রক্তাক্ত। খোলা চুল, আর বুকের মধ্যে যে হিংস্র নখ থাবাটা আঁচড়াচ্ছে, সেই থাবাটাই টানাটানি করছে তার বুকের আঁচল নিয়ে।

পালিয়ে আসে তুলসী। সত্যি তার ভয় করে সেই মূর্তি দেখে। কিন্তু পালিয়ে এলেও, আরো একটি আয়নায় নিজেকে দেখবার জন্য বিলুলিত হয়ে ফেরে নৈয়ায়িকের নীচু ছাদ-আঁটা নাটে। সমস্ত সংবিৎ যেন একটি সূচীমুখে জড় হয়ে পড়ে থাকে বন্ধ দরজাটার গায়ে। কখন পুরনো দরজাটা ককিয়ে উঠে খুলে যাবে।

তারপর এক সময়ে যখন দরজা খুলে যায়, তখন ন'কড়ির যাবার পথে তুলসী যেন দাঁড়িয়ে থাকে আনমনে। ন'কড়ি বলে, 'কি ব্যাপার' সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছ নাকি?'

তুলসী চোখ তুলে একবার তাকায়। মাথা ঝেঁকে পড়া চুল সরিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। কেন, ভয় করছে?'

ন'কড়ির দীপ্ত মুখে ছায়া সহজে ঘনায় না। বলে, 'ভয় করবে কেন?'

অভিমানের একাধিক ঝিলিক দেখা যায় তুলসীর ভ্রূতে। বলে, 'যদি আড়ি পেতে থাকি?'

ন'কড়ি হাসে হা হা ক'রে। বলে, 'পাত্‌তে পার, কিন্তু কথা বলেছি চুপিচুপি, দাদুর কানে কানে। শুনবে কেমন ক'রে?'

তুলসীর গলা যেন সহসা কঠিন শোনায়। বলে, 'শুনতেও চাই নে!'

ন'কড়ি বুঝি পেছুতে গিয়েএগিয়ে আসে দু' পা। বলে, 'তা জানি। কিন্তু রাগ করছ যে?'

তাতে চিন্তিত নাকি ন'কড়ি? কথার সুরে যে তারগুলি বাজে, তার মধ্যে একটিতে যেন স্নেহের আভাস বাজে। তুলসীর হাসতে ইচ্ছা করে। হাসি চেপে বলে, 'যেন আমি রাগলে তোমার কিছু যায় আসে?'

ন'কড়ি হেসে বলে, 'একটুও কি যায় আসে না?

তুলসী যেন ঘুমভাঙা স্বরে বলে, 'কতটুকু ঠাকুরপো ?'

জিজ্ঞেস ক'রে যখন তাকায় তুলসী, তখন তার চোখের পলক আর পড়তে চায় না। যে আরশিখানির জন্য তার প্রতীক্ষা, সেই আরশিতে যেন দেখতে থাকে নিজেকে। কিন্তু যেন আয়না যেন কতদূরে। নিজেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে, লজ্জাই যেন শিরশিরিয়ে ওঠে তার সর্বাঙ্গে।

ন'কড়ি স্বচ্ছ হেসে বলে, 'সেটুকু মেপে দেখিনি ভাই।' বলে দাঁড়ায় না, পা বাড়ায় যাবার জন্যে।

তুলসী ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় পথ আগলায়। বলে, 'সে কি, আজ তেষ্টা পায়নি বুঝি ?

ন'কড়ি বলে, 'তাও তো বটে, ভুলেই গেছি। শীগ্‌গির জল দাও।'

প্রথম প্রথম যখন সংকোচ করত তুলসী কাছে আসতে, তখন ওইটি অস্ত্র ছিল ন'কড়ির কাছে ডাকবার। কিন্তু কেন যে সংকোচ, সে খবর বোধহয় রাখেনি ন'কড়ি।

তুলসী বলে, 'তেষ্টার কথাও মনে করিয়ে দিতে হবে রোজ ?

ন'কড়ির দু'চোখে যেন সহসা অপার রহস্য পড়ে উপ্‌ছে। বলে, 'এত বারে বারে তেষ্টা, শেষে যদি না মেটে, তাই ভুলে থাকতে চাই।'

আয়নাটা বুঝি সত্যি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিজেকে আবিষ্কারের ভয়ে তখন তুলসী আর দাঁড়াতে পারে না সামনে। দ্রুত পায়ে জল আনতে যায় সে।

জল খেয়েই নামতে গিয়ে, সহজে নামতে পারে না ন'কড়ি। সিঁড়ির মাঝখানে গিয়ে থামে।

'কিছু বলছ ?'

'শুনতে পেয়েছ কিছু ?'

'না।'

তুলসী চুপ। হঠাৎ ন'কড়ি বলে, 'যে কথাটা সে কোনদিন না ব'লে পারে না, 'দাদুকে একটু বেশী করে দেখ বৌদি।'

আবার তুলসী মুখ খোলবার আগেই ন'কড়ি বলে, 'রাগ করো না যেন।'

তারপর চলে যায় সহজে স্বচ্ছন্দে, একটি বিশেষ অবাধ্য গতিতে।

রাগ রাগ রাগ। ভয় ভয় ভয়। সত্যি যেন তুলসীর সর্বাঙ্গে প্রলয়ের বাসনা ওঠে দপদপিয়ে।

তখন ন'কড়ির আর তার নিজের দেখতে পাওয়া ভয়টাই ভয়াল হয়ে ওঠে তুলসীর মধ্যে। প্রতিশোধের ভয়ংকরতা নিয়ে ছুটে আসে ন্যায়তীর্থের ঘরে, পীড়নে নিপীড়ণে বিপর্যস্ত করে দেয় বৃদ্ধকে।

মাড় ঢেলে দিয়ে, সেইদিন নিজের ঘরে বিছানায় পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল তুলসী।

আমি দেখছিলাম বন্ধ ঘরে নৈয়ায়িক চিৎকার করছিলেন খিদের জ্বালায়।

রাণীর বাজারের শেষ নৈয়ায়িক, ন্যায়তীর্থ চণ্ডীচরণ, যাঁদের ধনগৌরব তো বটেই, যাঁর মানের ও পুণ্যের গৌরব ছিল রাণীর বাজারের ধূলায়। যাঁর স্থবিরত্বের পূর্বে রাস্তায় বেরুবার শেষ দিনটিতেও রাণীর বাজারের আপামর মানুষ কপালে হাত ঠেকিয়েছে, গণিকারা দরজার আড়ালে লুকিয়েছে, মহাজন গুনতি পয়সা ফেলে, গদি থেকে নেমে প্রণাম করেছে। সেই তিনি চিৎকার করে কাঁদছিলেন শিশুর মত।

কাঁদছিলেন আর সারা গায়ের ফ্যান চেটে চেটে তবু খাচ্ছিলেন। দুটি ভাতের জন্য, ন্যায়তীর্থ রুগ্ন ঘ্যান্‌ঘেনে শিশুর মত ডাকছিলেন তাঁর পৌত্রবধুকে।

আমি মহাকাল নই। রাণীর বাজারের নানান সত্যমিথ্যায়, প্রলোভন ও ত্যাগের সঙ্গে জড়িত পাশ-বন্দী মানুষ। নির্বিকার নই, আমার বিকার আছে। ন্যায়তীর্থ রাণীর বাজারের কোন অদৃশ্য খতিয়ানের ঋণ মেটাচ্ছেন দেখে ইতিহাসের বুকে নিষ্ঠুর পদচারণা ক'রে অট্টহাসি হাসা আমার সম্ভব ছিল না।

আমি দেখছিলাম, ন্যায়তীর্থ হাজার চাটলেও তাঁর গায়ের রেখা

আর কোনদিন উঠবে না। রাণীর বাজারের বিধাতা তাই নৈয়ায়িকের গলায় গলা মিলিয়ে, কালের ধ্বনি দিয়ে, একটু নিজেকে হাল্কা করছিল। আমি কানে আঙুল দিয়েছিলাম।

তবু আমার মনে হয়েছিল, অনেক কলরবের মধ্যে একটি বাঁশীর সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে। রাণীর বাজারের মহৎ প্রাণের শেষ ক্ষুধার কান্না আমি চেয়ে দেখতে পারিনি। তাই চোখ বুজেছিলাম। ভাবছিলাম, আমার বুকের অনুভূতি থেকে শেষ রাগিনীর সুর উঠেছে বেজে।

মনে হয়েছিল, আমি কালের বাঁশী শুনছি। ন্যায়তীর্থের কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে, রাণীর বাজারের আকাশে কালের বাঁশীর সুর ধ্বনিত হচ্ছিল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে যখন তাকালাম, দেখলাম রাজা কথায় বলে,

শুয়োর বেশ্যা ষাঁড়
তিন নিয়ে রাণীর বাজার।

রাণীর বাজারের লোকেরা বলে রাগে ও দুঃখে। বাইরের লোকেরা বলে রসের র‍্যালা করে। কিন্তু রাণীর বাজারে যেমন ন্যায়তীর্থ আছেন, তুলসী আছে, তেমনি অনেকে, অনেকের মত আছে রাজা বাঁশীওয়ালা। রাণীর বাজারের লোকে ওকে চেনে রাজা কেওরা বলে।

রাণীর বাজারে আমি যেমন কাঞ্চনের লালসা দেখছি, দেখছি প্রবৃত্তির স্রোতের গাঁজলা, তেমনি দেখছি রাজা বাঁশীওয়ালার মত মানুষ, অচ্ছুতের অপমান যার ললাট লিখন, জীবনের কিছুই না পেতে যার জন্ম, সব বাধা ডিঙ্গিয়ে যে বেড়ে উঠেছে কেওরা পাড়ার শুয়োরগুলির সঙ্গে, মনে ও প্রাণে যার মরণের স্পর্শ লাগে না তবু। তাই যাত্রা গানের পালায় যেমন 'বিবেক' বিনে চলে না রাণীর বাজারের কথা বলতে গেলে তেমনি চলে না রাজা কেওরার কথা না বললে।

সেই ওকে আমার প্রথম দেখা। দেখেই আমার মনে হল, রাজা এই রাণীর বাজারের কালের রাখাল। ঠাঁই নিয়েছে সদর দেউরির চত্বরে, স্টেশনের সামনে, সিঁড়ির নীচে, নর্দমার ধারে। বাঁশী বিকোনোর

তালে বাজায় কিংবা শুধু বাজাবার তাগিদেই বাজায়, সেটা ওর বাজানো শুনে ধরার উপায় নেই। হয় তো রথ দেখতে গিয়ে যদি কলা বেচা হয়ে যায়, সেই ষোল আনার ওপরে এই বাজিয়ে ফেরার বাঁশীওয়ালা রাজা।

সেটা প্রথমে ভেবেছিলাম, যখন ওকে চিনতে পারিনি। পিঠে থলে ভর্তি নানান রং-এব বাঁশী, ঠিক ওর নিজের ছেঁড়া জামাটার নানান রং-এর তালির মত। বয়সের ছাপটা যেন কালানুচিত হতে পারেনি ওর কালো রং শরীরে। সেই জন্য বয়সটা বুঝে ওঠাই কঠিন। চোখে মুখে কোথাও তার বর্ণ শ্রেষ্ঠের ছাপ নেই। একেবারে নিখুঁত অষ্ট্রীক নরগোষ্ঠীর কোঁচকানো চুল, বোঁচা নাক, ছোট ছোট চোখ কুচকুচে কালো রং। হাসলে পরে চোখ মুখ কিছুই দেখা যায় না। গোটা মুখখানি ভর্তি শুধু একখানি হাসি। দেখলেই চেনা যায় কেওরাপাড়ার পাঁচি কেওরানির ছেলে এটা—রাজা কেওরা।

রাজার সঙ্গে আমি ভাব করতে গেলাম বাঁশী কেনবার ছল করে। রাজা পাশ ফিরে ওর থলিটা দিল এগিয়ে। খুবই নির্বিকার ভঙ্গিতে নিতান্ত অভ্যাসের বশে। সবাই জানে হাতে বাঁশী তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা রাজার চোখে মুখে সেই চিরকালের বিকি রহস্যের কবিতাখানিই লেখা ছিল।

ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি।
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

তবু একখানি আড় বাঁশী নিয়ে ফুঁ দিলাম। সেটা আমার পক্ষে বড় লজ্জা ও সঙ্কোচের কথা। এই চেনা চৌহদ্দির মাঝখানে ভিড়ের মধ্যে বাঁশী বাজাতে দেখলে আমাকেই লোকে কি বলবে? তা ছাড়া রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আনাড়ির মত বাজানই বা যায় কেমন করে? কে না জানে রাণীর বাজারের গানের জলসায় একবার রাজাকে নিয়ে কী বিশ্রী গণ্ডগোলই না হয়েছিল। কলকাতার রেডিওতে বাজিয়ে নাম করেছে, এমনি এক বাঁশীওয়ালা এসেছিল রাণীর বাজারের এক জলসায়। ‘হ্যাড্ডা ব্যাড্ডা’ বাজিয়ে রাজাকে

আগে বাজাতে দেওয়া হয়েছিল বেতার বাঁশী বাজিয়ের অনুমতি নিয়ে। কিন্তু রাজার গুরুগম্ভীর শঙ্খ নিনাদের মত বাঁশীতে সুস্পষ্ট সুর তুলতে শুনে বেতারওয়ালার ভ্রূ গেল কুঁচকে। রাজার দ্রুত তরঙ্গ যুক্ত বাঁশীর সঙ্গীতে লোকটা একেবারে খেপে বারুদ। রাজার বাঁশী মুগ্ধ জনতার সামনে বেতারওয়ালা বাজাবার মত কোন চেষ্টাই করলে না, পরিষ্কার বলেই দিলে তাকে অপদস্থ করার জন্য নাকি রাজাকে আগে বাজাতে দেওয়া হয়েছে।

বেতারওয়ালা শুধু রাজাকেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার গুরু কে?'

'রাণীর বাজারের নন্দ হাড়ী।'

'হাড়ী?'

'আজ্ঞে।'

'করে কি?'

'ঝুড়ি বোনে। খেয়া ঘাটে মাঝে মাঝে বদ্‌লি মাঝির কাজ করে।'

'অ। বয়স?'

'বুড়ো হয়েছে?'

'হুঁ।'

বেতারওয়ালা চলে গিয়েছিল তারপর। জলসার উদ্যোক্তারা ভাবলে যত গণ্ডগোলের আপদ এই রাজা কেওরাটা। ব্যাটাকে বাজাতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

সুতরাং এই রাজার সামনে বাঁশীতে সুর তুলব তেমন সাধ্যি আমার নেই। বাঁশীটা ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তো—'

'কেওরাপাড়ায় থাকি।'

'ও।'

'আজ্ঞে, বাপের নাম ছেল আকু কেওরা মার নাম পাঁচি কেওরানি।'

কথার মধ্যে ঝাঁজ আছে বলে ভুল হতে পারে। আসলে কথা না বলবারই ইচ্ছে।

বললাম, 'যে সুরটা বাজাচ্ছিলে, সেটা একটু অসময়ে হয়ে গেল।'

রাজা ওর ছোট ছোট চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আজ্ঞে মনের কোন সময় নেইকো। তার দিনকে রাত মনে হয়, রাতকে দিন। সাঁঝ বেলার সুর বাজাতে ইচ্ছে হল, তাই বাজিয়ে দিলুম।'

বললাম, 'সেটা তোমার ইচ্ছেয় বোধহয় হয়নি রাজা। দ্বিজপাড়ার ন্যায়তীর্থ মশাই বন্ধ ঘরে বসে কাঁদছিলেন, তখন তোমার বাঁশীতে ওই সুরটা বাজছিল। আমার মনে হল, তুমি যেন কালের রাখাল।'

রাজার মুখে নাক-চোখ-মুখ হীন হাসিটা দেখা গেল। বলল, 'আজ্ঞে, কালের রাখাল বলে ফেলে দিলেন? তা হ'লে যে আর নিজের জন্যে বাজানো যায় না বাবু।'

বললাম, 'তোমার নিজেরটাই এখন সকলের হয়ে গেছে রাজা।'

দেখলাম, রাজার মুখের কোঁচকানো চামড়া টান টান হয়ে উঠল। রাণীর বাজারের পশ্চিম দিকে তাকিয়ে খালি বলল, 'সকলের?'

রাজার এই মুখ দেখলে, সবাই রাণীর বাজারের ছাপ খুঁজে পাবে। রাজা রাণীর বাজারের এক অলিখিত ঋণপত্রে টিপ সই দেওয়া খাতক। বাজিয়ে ওকে সেই ঋণ শোধ করতে হচ্ছে।

কেওরাপাড়ার জমি আর যুবতী মেয়ে, রাণীর বাজারের চিরদিনের উত্থানপতনের খেলোয়াড়দের খেলার জিনিস ছিল। সেই খেলার ঋণেই আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা আছে রাজা।

যেদিন রাজার বাবা আকু কেওরা মারা গেল, কালো রায় সদলবলে এল সেইদিনই। তখনো আকুর শব শ্মশানযাত্রা করেনি। ঘরের বাইরে, পাঁচি কেওরানি আকুর স্পন্দনহীন মরা বুকে পড়ে কাঁদছিল কপাল কুটে কুটে।

কালো রায় এসে বললে পাঁচি কেওরানিকে, 'ঘরের জিনিসপত্তর বার করে নাও, ওতে আর হাত দেব না। কিন্তু ঘরটা দখল করব।'

কড়া হুকুম হল কেওরাপাড়ার জমিদার কালো রায়ের। রায় পদবী নয়, কোন এক কালের পাওয়া খেতাবটাই কালো বাঁড়ুজ্জেরা চালিয়ে

আসছে! রাঢ়ীয় শ্রেণীর নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ।

রাণীর বাজারের গঙ্গার নীচু পাড় জুড়েই যত অন্ত্যজদের বাস। কেওড়াপাড়ার জমিদার একজন, হাড়িপাড়ার আর একজন। মুচি-পাড়ার জমিদার একজন, ডোমপাড়ার আর একজন। দেখে আর শুনে মনে হয়, রাণীর বাজার জমিদারের দেশ। মাঝে মাঝে এই সব পাড়ার রাজাদের লড়াই হয়, উলুখাগড়াদের প্রাণ যায়।

হঠাৎ হঠাৎ রব ওঠে, পাত্‌তাড়ি গুটোও, পাত্‌তাড়ি গুটোও।

ব্যাপার কি? না, রাজা বদল হয়েছে।

কোথায় যেতে হবে?

এমন কিছু দূরে নয়। এক ঘর হাড়ি যায় ডোমপাড়ায়, দু'ঘর কেওরা যায় মুচীপাড়ায়।

এখন অবশ্য সেকথাটি আর চলে না। রাণীর বাজারে জমির বড় টানাটানি। দেশ ভাগাভাগি হয়ে বাড়ির অকুলান। লোকে জমি কিনতে চায়। পঁচিশ টাকা কাঠার জমি হাজার টাকায় সাধ্য সাধনা করে লোকে। সুতরাং একবার উচ্ছেদ করতে পারলে আর কেউ পুরনো লোককে বসতে দিতে চায় না। একেবারে নতুন মানুষকে বিক্রী করে দেয়।

সেই জন্যে, হালের রাণীর বাজারের অন্ত্যজপাড়ায়ও দেখা যাবে, নতুন বাড়ি উঠেছে। হাল ফ্যাসানের নতুন বাড়ি, দেয়ালের চেয়ে জানালা বেশী, কাঠের চেয়ে কাঁচ বেশী। ঘরে ঘরে জ্বলে বিজলী বাতি। অষ্টপ্রহর গান আর বক্তৃতা শোনা যায় রেডিওতে।

কিন্তু কেওড়াপাড়া, এখানো কেওরাপাড়াই। হাড়িপাড়া হাড়ি-পাড়াই। পৌরসভার নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে এখনো মরা গরু ভেড়া ছাগল কুকুর এখানেই এনে ফেলা হয়। সেই একই শকুনেরা তাদের বংশপরম্পরা 'মোচ্ছব' ক্ষেত্র ছেড়ে পৌরসভার নির্দিষ্ট ভাগাড়ে যায় না। হেঁদো ডোম এসে এখনো ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়াতে বসে যায় গঙ্গার ধারে। শুয়োরেরা তাদের জন্ম-মৃত্যুর খেলা খেলে চলেছে ঠিকই।

আর, যদিও পৌরসভার বার্নিং ঘাট নির্দিষ্ট আছে বৈদিকপাড়ার

সীমানায় হীরাপুরের খালের ধারে, তবু রাণীর বাজারে সব ঘাটই শ্মশান, কেবল লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা খেয়া ঘাটের সীমানাটুকু ছাড়া। তাই রাণীর বাজারের মৃত্যুর সঠিক হিসাব যদি কারুর কাছে পেতে হয়, তবে তা এই কেওরা হাড়িডোম পাড়ারই বুড়োবুড়িদের কাছে পাওয়া যাবে।

কালো রায়ের দখল নিতে আসার মত ঘটনা নতুন নয়। আকু কেওরার গতি হয়নি? না হয়েছে তো না হয়েছে। আইন তো আইন। আকু কেওরার জীবনস্বত্ব ঠিকে, যে মুহূর্তে আকু মরেছে, সেই মুহূর্তেই তার দাবী শোধ হয়েছে। সুতরাং এই মুহূর্তে ঘর খালাস করে দিতে হবে। অবশ্য ঘরটাও খুলে নিয়ে যেতে পারে পাঁচি। রাজা তখন ছোট। যদিও নন্দ হাড়ীর সাকরেদি শুরু হয়ে গিয়েছে তার অনেক দিন আগেই। সোজা বাঁশী নয়, প্রথম হাতেই আড় বাঁশী। যদিও বাঁশী তখনো রা কাড়েনি। শুধু ফুঁ দেবার পালা চলছিল। কখনো কখনো হঠাৎ আর্তনাদের মত দো-আসলা স্বর ফুটছিল কেবল। বাপের সঙ্গে ও তখন রাজাপুরের গাঁয়ে যায় বাঁশ আনতে। বাপ আর মা বোনে চ্যাঙারি, ঝুড়ি, চুবড়ি। রাজা তল্‌তা বাঁশে ফুটো করে লোহার শিক গরম করে।

কিন্তু জীবনরহস্যের ভয়ংকরতা বাঁশীর কথাও ভুলিয়ে দিল যেন। হাতে বাঁশী, চোখে জল, রাজা হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল কালো রায়ের দিকে।

গরু মরলে নাকি মাছি খবর দিয়ে আসে আকাশে শকুনের কাছে। একলা কালো রায় নয়, অন্ত্যজপাড়ার জমিদারেরা সবাই এসেছে খবর নিতে। কোন্ সীমানায়, কার জমিতে মরল, দেখতে এসেছে সবাই। নইলে ফাঁকি প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। কে কোন্‌খান দিয়ে এসে কাগজ-পত্রে কি লিখিয়ে, কার টিপসই নিয়ে ব'সে থাকবে, নিশ্চয়তা কি?

এই গোটা পাড়াগুলি যেন কোর্টকাছারির হিসেবনিকেশ মানে না। যেন যার যে দিক দিয়ে রাজা বোরে চ'লে গেলেই হল, কিস্তীমাৎ?

আকু কেওরার বুকের ওপর থেকে উঠল পাঁচি। অর্ধদিগম্বরী,

পাঁচির সে-মূর্তি ভয়ংকরী। বয়স তখন অল্পই তার। আয়েস জীবনের লাবণ্য না থাক্, রুক্ষ যৌবনের বন্যতা তখনো পাঁচির সারা অঙ্গের ওঠানামায়। এক পিঠ সাপ কিলবিলে রুক্ষ চুল। ভর দুপুরে, গঙ্গার সেই উঁচু পাড়ে, মনে হল পাঁচির ছায়া পড়েনি মাটিতে। ভাগাড়ে বোধ হয় মরা ছিল, আকাশে তখন শকুন উড়ছে। আকুর গর্ভবতী ধাড়ী শুয়োরটাও সেই মূর্তি দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল। যেন বলতে চাইল আমাকে মেরো না, আমি কোন ক্ষতি করিনি।

পাঁচি বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে কালো রায়কে গাল দিল, অভিশাপ দিল।

কালো রায়ের লোকেরা হুকুম পেয়ে, ঘরের বেড়া দিল ভেঙ্গে।

হয়তো কালো রায় কিছু ক্ষমা ঘেন্না করতে পারত। রাণীর বাজারের আদি লোক হ'লে হয়তো আজকের মত নিষ্কৃতি দিত। মৌরসী পাট্টা গাড়বার আগে, জীবনস্বত্ব বাতিল ক'রে নতুন করে ঠিকে দিতে পারত পাঁচি কেওরানির নামে। কেন না, এসব দেশবিভাগের আগের কথা। জমি তখন অকুলান নয়।

কিন্তু কালো রায়েরা এখানকার লোক নয়। রাণীর বাজারে সে দৌহিত্রের সম্পত্তি পাওয়ার সূত্র ধরে এসেছে।

রাণীর বাজার তার কাছে আজও বিদেশ। যদিও স্থায়ী হয়ে বসেছে সে এখানে।

কালো রায়ের রাণীর বাজারে আসা, সে আর এক কাহিনী। সে কথা পরে আসবে।

মায়ের দিকে তাকিয়ে রাজার ভয় করছিল বটে। কিন্তু কালো রায় ভস্ম হচ্ছিল না, সেই ক্ষোভে সে বাঁচেনি।

পাড়ার লোকজনেরা সবাই হাতাহাতি ক'রে ঘরের জিনিস বার করলে। কিছু কাঁথা, মাদুর, তেলচিটে বালিশ; গোটাকয়েক কলাই এলুমিনিয়ামের থালা, গেলাস, আকুর সারা জীবনের সম্পত্তি।

কিন্তু ব্যাপার ঘটল অন্যরকম। কালো রায়ের ভাইপো শম্ভু। শম্ভু দাঁড়িয়েছিল কাছেই। খুড়ো ভাইপো চিরদিনের সাপে নেউলে

সম্পর্ক। যে ভাইপোকে কালো বলে বেজন্মা, রাণীর বাজারে সেই তার প্রধান শত্রু। শুধু রাণীর বাজারে নয়, তার জীবনেই সবচেয়ে বড় শত্রু। সেই শম্ভুর জন্মেরও আগে রাণীর বাজারের নবকিশোর চাটুজ্জের বিধবা মহামায়ার শেষ অবস্থার সংবাদ পেয়ে যেদিন প্রথম এল কালো, আর কালোরই পিছনে পিছনে নবীনের স্ত্রী কিরণও এল মুমূর্ষু নবীনকে একলা ফেলে, সেইদিন থেকেই—

সে কথা পরে।

শম্ভু এল, এসে দাঁড়াল একেবারে আকুর শবের কাছাকাছি। শম্ভু বলল, 'জায়গার অভাব কি? পিটুলীতলায় ভোলা কেওরার জায়গাটা তো ফাঁকাই আছে। ওটা আমার সীমানার মধ্যে। ঠিকে বন্দোবস্ত লেখাপড়া ক'রে নিও, আকুর বউকে এখন ওখানেই উঠতে বল।'

সকলের যেন সংবিৎ ফিরল। সবাই ফিরে তাকাল শম্ভুর দিকে। খুড়োর সঙ্গে ভাইপোর চেহারার কোন মিল নেই। কালো রায় ফর্সা মোটা বেঁটে। শম্ভু শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, প্রত্যহের দেহচর্চায় কেমন একটু সুঠাম বলিষ্ঠতা কিন্তু স্নিগ্ধতা তার অঙ্গে অঙ্গে। কালো রায় যখন হিংস্র হয়ে বলে, 'রায় বংশের রক্ত মাংস কিছু নেই ওই অ-জাতের গায়ে', শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বংশগত চেহারায় বিশ্বাসী মন টলে উঠতে চায়। কালো রায়ের দাদা, শম্ভুর বাবা মুমূর্ষু নবীনকেও যারা দেখেছে রাণীর রাজারে, তারাও জানে, শম্ভুর সঙ্গে নবীনের সত্যি কোন মিল নেই। মায়ের সঙ্গেও মিল নেই শম্ভুর। শুধু কিরণের চোখ দুটি ছাড়া। সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত শ্বেত অপরাজিতার রেণু জুড়ে বসে থাকা ভ্রমরের মত সেই চোখ। আর আজানুলম্বিত বলিষ্ঠ দুটি হাত। অত বড় হাতও নেই রায় বংশে। যে-হাত একবার মাত্র কালো রায়কে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছিল। কালো রায়কে অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। সে শম্ভুর সামনে দাঁড়িয়ে ওকে গালাগাল দিয়েছিল। সেই শেষ, আর কোনদিন কালো রায় শম্ভুর সামনে দাঁড়িয়ে গাল দেয়নি।

শম্ভুর আশ্বাসবাণীতে আড়ষ্ট মানুষগুলি সব যেন দিশা ফিরে পেল। শম্ভু রায়ের সঙ্গে তাদের কিছু যেন জানাজানি আছে।

কিন্তু তখনো পাঁচি চুপ করল না। সে গঙ্গার দিকে মুখ ক'রে, চিল-গলায় যে-সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে গেল, তার মর্মার্থ হল এই যে ঘাটের মরা মিনসে (কালো) আজ তাকে আইন দেখিয়ে, মরা স্বামীসহ ঘরের বার করলে, পাঁচির কাছে তার অভিসারের কথা পাঁচি কেওরানি ভুলে যায়নি। এও ভুলবে না, রসের নাগরের সঙ্গে সে যদি ভাগাড়ের অন্ধকারে গিয়ে পীরিত করত, তবে আজ তাকে উচ্ছেদ হতে হ'ত না। যে-মেয়েমানুষদের ছায়া দেখলে কালো রায়দের স্নান করতে হয়, তাদের পা চাটতে আসতে ঘেন্না করে না, পাঁচি তাদের মুখে থু থু দেয়, তাদের গোষ্ঠির মুখে ইত্যাদি। মরা আকুকে সাক্ষী ক'রে এসব একথা সাড়ম্বরে বলল পাঁচি।

মেয়েরা এসে ধ'রে ক'রে শান্ত করল তাকে।

আর এ ধর্মের পৃথিবীতে যদি ব্রহ্মতেজ ব'লে কোন বস্তু থাকত, কবে কালো রায়ের চোখের আগুনে তার ভাইপো শম্ভু পুড়ে মরত।

কিন্তু শম্ভু অম্লান।

রাজা বুঝল, মায়ের সঙ্গে থাকবার জন্য একটি বাসস্থান তাদের হল, তবু কালো রায়ের প্রতি ঘৃণা তার গেল না। মানুষকে ঘৃণা এবং রাগ করে মেরে ফেলার মত রাগটা তার গেল না কিছুতেই। কেওরাপাড়ার কেওরা ছেলেদের মত জীবনমরণের এ খেলাকে সে আবহমান ব'লে স্বীকার করল না। রাজা ঘৃণা করতে শিখল।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল। আকুর মরা নামিয়ে নিয়ে গেল কয়েকজন গঙ্গার ধারে। কয়েকজন মিলে, আকুর পুরনো বেড়া আর চাল দিয়েই ঘর খাড়া ক'রে ফেলল, ভোলা কেওরার পতিত ভিটেতে।

কেবল, ঘরে গেল না পাঁচি। কেওরাপাড়ার বটের তলে, মনসাতলায় প'ড়ে রইল উপুড় হয়ে। নন্দ হাড়ীর কাছে রইল রাজা। বাপ মরেছে, কালো রায় ঘর ভেঙে দিয়েছে, নতুন ঘর হয়েছে, মা প'ড়ে আছে গাছতলায়, তবু রাজার বাঁশীতে ফুঁ দেবার সাধ ঠোঁটের কুলে এসে কাঁপতে লাগল। নন্দ হাড়ীর কোন ঘর নেই। বচন সাধুখাঁর জমিতে তার বাস ছিল হাড়ীপাড়ায়। তার নয়,

তার বিধবা মায়ের বাস ছিল। বচনের সঙ্গে তার মা নষ্ট হয়েছিল। নন্দ তখন ধরা-সরা যোয়ান তাই শুধু মাকে নয়, বচনকে নাকি মেরে আধমরা ক'রে সে রেখে এসেছিল বচনের বারবাড়ির বারান্দায়। তিন বছর জেল খেটেছিল নন্দ।

ফিরে এসে শুনেছিল, শুধু তার শোকেই মা মারা গিয়েছে। নন্দ আর কোনকালে ঘর বাঁধেনি। দুর্বৃত্ত বলেই কুখ্যাত হয়েছিল সে। কিন্তু দুর্বৃত্তের হাতের বাঁশীটা কেমন ক'রে মায়া ছড়ায়, সেটাই বিস্ময়! তখনকার রাণীর বাজারের খেয়াঘাটের বিরিঞ্চিলাল ঘাটদার সেই বাঁশী শুনেই মাঝির কাজ দিয়েছিল তাকে।

কিন্তু কোনকালেই নন্দ একঠাঁই থাকবার মানুষ নয়। খুটনী নৌকোয় ক'রে বিদেশী মাল্লাদের সঙ্গে কলকাতার বন্দর আর পশ্চিম দেশের ঘাটে ঘাটে ঘুরেছে। এই চল্লিশ বছর বয়সে, রাণীর বাজারের ঘাট ছেড়ে আর কোথাও এখন যেতে ইচ্ছে করে না নন্দ হাড়ীর।

রাত হয়েছে বুঝি অনেক।

গঙ্গার ভাটা নামা নরম পলিমাটি কাদায় কেওরাপাড়ার শুয়োরেরা ফিরে এসেছে শহর পরিভ্রমণ সেরে। শকুনের মত পুরীষ-আলয়ের নীচুতলা, নর্দমা আর আস্তাকুঁড় ঘেঁটে বেড়ায় কেওরাপাড়ার জানোয়ারেরা। রাত্রে এসে আশ্রয় নেয় গঙ্গার ঘাটের পাঁকে।

গায়ে গায়ে মুখে মুখ দিয়ে প'ড়ে আছে শুয়োরগুলি। শকুনেরা গাছে না উঠেও রাণীর বাজারের অন্ত্যজঘাটে নিরাপদে থাকে পালকে মুখ গুঁজে। বাতাসে দুর্গন্ধ দক্ষিণের ঝাপটায় চলেছে উত্তরে।

গঙ্গার জলে সমুদ্রসঙ্গমের গান। তার কালো বুকে নক্ষত্রেরা স্রোতের দীর্ঘ ঝলক-রেখায় যাচ্ছে হারিয়ে।

আকুর মৃত্যুতে কোন শোকের ছায়া পড়েনি কেওরাপাড়ার ঘাটে। সে হিসেবে, কেওরাপাড়ার ঘাট চিরশোকের তীর্থ। অবসানেরই ইতিবৃত্ত তার পাষাণহীন ঘাটের প্রতি স্তরে স্তরে।

শোক শুধু মনসাতলায়, সেখানে পাড়ার বুড়িরা এখনো ভিড়

করে আছে পাঁচিকে ঘিরে। কারণ তাদের জানা আছে, পাঁচি এখন আর তাদের মত এই পাপলোকে নেই। জীবিত অবস্থায়ও পাঁচি এখন অন্য সংসারের জীব। কেমন ক'রে এমন হয়, তারা জানে না, কিন্তু হয়। তাই তারা করজোড়ে ঘিরে বসে থাকবে পাঁচির কাছে, কারণ পাঁচির মধ্যেই এখন তাদের অপরিচিত বিশ্ব-রহস্য এসে ঠাঁই নিয়েছে। বিশ্বরহস্যকে তারা প্রত্যক্ষ করতে চায়।

রাজা তাই নন্দ হাড়ীর কাছেই এসেছে। নন্দ একটি কথাও বলেনি। গঙ্গার ধারে, আশসেওড়ার জঙ্গলের উঁচু ঢিবিতে তাড়ির ভাঁড় নিয়ে সে বসেছে, ঢোঁকে ঢোঁকে খেয়েছে।

তারপর রাজাকে বলেছে, 'হাঁ কর, খাইয়ে দিই, নইলে বাপের জন্য মন কেমন করবে খালি।'

গুরুর আদেশ। রাজা কয়েক ঢোক খেয়েছে।

নন্দ রাজার ছোট বাঁশীটি তুলে নিয়েছে। ফুঁ দিয়ে বলেছে, 'ইস্! আঁতুড় ঘরের ছেলের গলা যে রে!'

তা হোক, তবু নন্দ বাজিয়েছে।

প্রথমে আর্তকান্নার মত। তারপর কখন কান্নার আর্তধ্বনি শেষ হয়ে, মিষ্টি সুর বাতাস, গঙ্গা ও আকাশটাকে মাতাল ক'রে দিয়েছে টের পাওয়া যায়নি।

রাজার মনে হল, সুরটা একটি জীবন্ত প্রাণীর মত। তার মধ্যে তার বাবা আছে, মা আছে, এই সংসারের সব কিছুই যেন ওই সুরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। শম্ভু রায় আছে, কালো রায়ও আছে। পৃথিবীর একটি বিচিত্র রহস্য যেন সেই সুরের মধ্যে দুলে দুলে উঠছে।

তারপর বাঁশীটা নন্দ তুলে দিল রাজার হাতে। বলল, 'বাজা।'

বাজাবে? ভাল করে স্বর ফোটাতে পারে না বাঁশীর, বাজাবে কেমন করে রাজা?

নন্দ বলল, 'ফুঁ দে। ফুঁয়ের মধ্যে গান কর, গানের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আঙুলগুলো ওঠাপড়া করবে, দেখিস। বাজা।'

ভয় করতে লাগল রাজার। তবু বাজারের কাছে বসা সেই অন্ধ

ছেলেটার গান তার মনে পড়ল। সেই চিৎকার ক'রে, সুর ক'রে ক'রে বলা ঃ

আমার এই জগ ত কেউ নাই গো।

রাজা ফুঁ দিল বাঁশীতে। স্বর ফুটল। তারপর যেন কোন যাদুস্পর্শে, তার কানে গিয়ে ঢুকল

আমার এই জগতে কেউ নাই গো।

শুধু একটাই লাইন, একটাই সুর. রাজা তার ব্যথা ধরে যাওয়া ঠোঁটে বাজাতে লাগল। নন্দ বলতে লাগল, 'বেশ! আচ্ছা? হুঁ। পেথম থেকে কান্না ধরলে বাবা? বেশ। বাঃ বাঃ, আরে বাবা! বুকে বেঁধে যে? বাহ্‌বা বাহ্‌বা! বাজা বাজা, ওই একটাই বাজা।'

সাত দিন সাত রাত্রি ধরে প'ড়ে রইল পাঁচি মনসাতলায়।

সবাই সংগ্রহ ক'রে দুধ এনে খাইয়েছে পাঁচিকে। সেটা আসলে পুণ্যি করার জন্যেই। কারণ দুধ পাঁচি খায়নি, পাঁচির অর্ধচৈতন্য মুখ দিয়ে আর কেউ খেয়ে বিশ্বরহস্যের এক বিচিত্রকে প্রমাণ করেছে। সেই রহস্যেরই এক অতল অন্ধকারের শব্দ তীক্ষ্ণ লু লু করে বেজে উঠেছে মেয়েদের উলুর মধ্যে দিয়ে।

সাতদিন নন্দর কাছেই রাজা খেয়েছে থেকেছে। একটা ছেড়ে দুটি, তিনটি চারটি লাইন বাজিয়েছে। পাঁচি খোঁজও নেয়নি।

সাতদিনের অন্তহীন শোকের পালা শেষ করে এল পাঁচি। প্রথমে বলল, 'আমার ছেলে?'

ছেলে এল। রাজাকে বুকে নিয়ে স্নান করে এল পাঁচি। কেওড়াপাড়ার বিধবাদের থানের ঠাট্ নেই। পুরনো কাচা শাড়ি পরল পাঁচি। চার ইঞ্চি আয়নায় মুখ দেখে কাঠের চিরুনি দিয়ে মাথা আচড়াল। শম্ভু রায়ের ঠিকে ঘরে বসে আকুর অসমাপ্ত বাঁশের কঞ্চি আর কাটারি নিয়ে বসল। গাভীন শুয়োরীটাকে ডেকে কাছে শোয়াল।

এতদিনে শোক প্রকাশ করল শুয়োরীটা। যেন কেঁদে কেঁদে বললে, বাবুদের বাড়ির ফ্যান পচা পাত্‌কো এনে কতদিন খেতে

দাওনি আমাকে। পেটে আমার ছা', শহরে গিয়ে, ঘুরে ফিরে আর খেয়ে আসতে পারিনে আমি।

পাঁচি কেওরানী আং‌টা লাগানো টিন নিয়ে ঘুরে এল বাড়ি বাড়ি। খাওয়াল গাভীন জানোয়ারটাকে।

কিন্তু পাঁচির মুখে কথা নেই।

কেন ?

মাস পেরিয়ে গেল। শুয়োর বিয়োলো। পাঁচি ঝুড়ি চুপড়ি বিকিয়ে রোজকার রোজ ছেলে নিয়ে খেল। গালে হাত দিয়ে শুনল ছেলের বাঁশী। কিন্তু রাতে ঘুমোল না, কথা বলল না কারুর সঙ্গে।

কেন ?

শোকের ছায়া গেল, মাথার জটা তৈলাক্ত হ'ল। সিঁদুরবিহীন সাদা সিঁথিতে, কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলা খালি হাতে, শত লাঞ্ছনাতেও উদ্ধত নিটুট শরীরের নতুন লাবণ্যে, ত্রিশ পেরিয়ে যাওয়া পাঁচিকে মনে হয় কেওরাপাড়ার আইবুড়ো মেয়েটি কি এক ভাবে মগ্ন হয়ে রয়েছে।

কেন ? শোক কি কাটেনি পাঁচির ?

যেন গাছপালা স্থির, কীট পতঙ্গ স্তব্ধ, সারা আকাশটা আড়ষ্ট, ধরিত্রী সহসা কঠিন নির্বাক বিমূঢ় অচেতন।

কেন ?

তারপর একদিন আচমকা তার পায়ের শব্দ শোনা গেল। গঙ্গার ধার থেকে সেই থ্যাব্‌ড়া থ্যাব্‌ড়া পা দুটি, গভীর রাত্রির অন্ধকারে জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে গঙ্গার উঁচু পাড়ে এল উঠে। যে পায়ে, বহু দেশের ধূলি আর বিশ্বরহস্যের ছাপ তার ফাটা ফাটা এবড়োখেবড়ো দাগে। সেই পায়ের নিশ্চিত পদক্ষেপে ধরিত্রীর নির্বাক বিমূঢ়তা যেন শিউরে উঠল। এসে দাঁড়াল পাঁচি কেওরানির বন্ধ ঘরের দরজায়। দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল পাঁচি। প্রত্যাশাব্যাকুল বিস্রস্তবেশিনী লুণ্ঠিত-কেশিনী, বিশ্বরহস্যের আদিম রশ্মিচ্ছটা কেওরানির জলে ভেসে যাওয়া চোখে।

শোক গিয়েছে, নতুন সাজ হয়েছে, নবজন্ম হয়েছে কিন্তু বিশ্বরহস্যের

প্রাণ সংলগ্নের সহজ মানবী পাঁচি রূপান্তরের কান্নাটা কাঁদতে পারেনি। পৃথিবীর মত বিশ্বরহস্যের অঙ্গ চিরসতী পাঁচি নির্বাক বিমূঢ় হয়েছিল।

অন্ত্যজপাড়ার হৃদয় ও রক্তলীলা প্রকৃতির মতই চিরযৌবনের লীলায় অমোঘ রূপান্তরের জগৎ-সুন্দরী। পাঁচির অকূল সায়রে, সায়রের ঝড়বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে নির্ভীক শক্তপ্রাণ মাঝি এসেছে পাড়ি দিতে।

আকু গেছে নন্দ হাড়ী এসেছে। এই যাওয়া-আসার মাঝে স্বভাব লয়ে চিরবিশ্বাসী পাঁচি তাই নন্দর বুকে পড়ে কাঁদছে অঝোরে। বহু, বহুদিন পরে নন্দর কঠিন পাষাণ শিলা স্খলিত প্রস্রবণে, পাঁচি আবার মানবী জন্ম পেল। কান্নার পরে পাঁচিব চিররহস্যের হাসির কিঙ্কিনী শুনে, রূপান্তরবিলাসিনী শান্তনুর গঙ্গা ভাটার জলে ছুটে গেল মহাপ্রলয়ংকর অশেষ অরূপে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নন্দর বুকে মুখ চেপে বলল পাঁচি, 'লোকে বোঝে না।'

নন্দ বলল, 'কোনদিন বোঝে না।'

পাঁচি বলল, 'কি যে হয়। ছাই মরণ!'

কঠিন ও বিহ্বল সোহাগে নন্দ বলল, 'সেটা কেউ জানে না।'

রাণীর বাজার দিনে জাগে, রাত্রে জাগে।

রাণীর বাজারের রাত্রি সেদিন পাঁচি কেওরানির জন্য জেগেছিল।

শুধু বিশ্বরহস্যের এই বিচিত্র লীলা দেখে রাজা প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তারপর নন্দ হাড়ীর মত মানুষকে বাবা পেয়ে, পিতৃশোক ভুলে সেও পৃথিবীর চির-শিশু-সন্তানের দলে ভিড়ে গেল।

নন্দ পাঁচির ঘরে থাকে না। তবু বাকি থাকে না জানাজানি হতে। শ্বাপদ-সমাজের মতই, বিনা দ্বন্দ্বে কেউ কারুর অধিকার কায়েম করতে পারে না এখানে।

কেওরাপাড়ার বুড়ি ছুঁড়িরা ধিক্কার দিতে লাগল পাঁচিকে। ঘটনা নতুন নয়, পুরনো। সমাজের ওপরের পাটে পাটে অনেক নতুন ভাঁজ পড়েছে, সেলাই সংস্কার হয়েছে। নীচেটা রয়ে গিয়েছে যে-কে সেই।

পাঁচির পূর্বসূরী নায়িকার অভাব নেই পাড়ায় কিন্তু তা বলে, মনসাতলায় দাঁড়িয়ে ধিক্কৃত কেন করবে না। নইলে পাঁচি কেওরানি নায়িকা চিহ্নিত হয় কেমন করে।

কেওরাপাড়ার পুরুষেরা নন্দর শাস্তি দাবী না করলে নায়ক বলে চেনা যায় কেমন ক'রে তাকে?

দ্বন্দ্ব এখানে পঞ্চায়েতের লড়াই, শাস্তি জরিমানা।

কিন্তু নন্দ জন্মক্ষণ থেকেই বোধ হয়, সোজা পথ পায়নি। প্রারম্ভেই বেঁকে থাকার ⌐রুন, এখানেও সে বাঁকা। জরিমানা অর্থাৎ গোটা পাড়াকে ভাত আর শুয়োর ভোজ দেওয়া। সে ক্ষমতা আর তার নেই। আর পাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করেই সব পুরুষ কেওরাদের আহ্বান করলে, 'কে কি বলতে চাও, বল। ট্যাঁকের যুত্ নেই, জরিমানা দিতে পারব না। আর পারলেও, দেব কেন, সেটা বুঝিয়ে দাও।'

বোঝাবার মত ইচ্ছে কারুর ছিল না। আর যে এভাবে বলতে পারে, তার জয় ঠেকানো যায় না।

জীবনরহস্যের আধার। নন্দ হাড়ীর সেই দুর্বিনীত মূর্তি দেখে রাজা খুশী হল মনে মনে, কিন্তু অপমানিত মনে হল তার নিজেকে। এ অপমান বোধটাও বোধ হয় বিশ্বরহস্যের মধ্যেই পড়ে। নন্দ হাড়ীকে ভালবেসেও রাজার ইজ্জতে যেন দাগ লেগে রইল।

নন্দ নয়, জরিমানা দেবার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলে না পাঁচি শুয়োরছানা বেচে, চাল ভাজা আর তাড়ি খাওয়ালে সবাইকে। শান্ত হল কেওরাপাড়ার আত্মা। হয়তো আকুর আত্মাও। কারণ, সকলের চোখের আড়ালে এই জরিমানার চাল ভাজা আর তাড়ি পাঁচি আকুর উদ্দেশ্যে রেখে এসেছিল গঙ্গার নির্জন পাড়ে। স্বচক্ষে দেখে এসেছে একটা কাককে সেই চাল ভাজা ঠুকরে ঠুকরে খেতে। সেই কাককে জোড় হাতে বলে এসেছে পাঁচি, 'শাপ দিওনাকো।'

নতুন সুরের মাতামাতিতে রাজাকে রেখে দিল পাঁচি শুয়োরছানা-গুলির সঙ্গেই।

সংসার এমনি নিষ্ঠুর মনে ক'রে রাজা অসহায় অবাক চোখে চেয়ে

থাকেনি। বাঁশি নিয়ে মেতে রইল সে। নন্দ মাঝিগিরি করে ইচ্ছামত। পাঁচিরটা বসে খেতেই সে অভ্যস্ত হল। আর তালিম দিয়ে চলল রাজাকে। রাজা তাকে মাৎ ক'রে দিয়েছে এর মধ্যেই। অনেকগুলি সুর বাজাতে শিখেছে সে।

তারপরে রহস্য দেখল রাজা, তার আবার ভাই হয়েছে।

বিশ্বরহস্যের আরো চাতুরি দেখল রাজা। দেখল, তার মার সঙ্গে নন্দর ঝগড়া। দেখল, নন্দ হাড়ী মারছে তার মাকে ধরে। দেখল শুয়োরছানা সব বিকিয়ে গিয়েছে। বেড়ার গোঁজা ভাঙা, চাল ফুটো, মেঝে কাদা কাদা, হাঁড়িতে ভাত নেই।

সে দেখল, মা তাকে মারছে, ভিক্ষে করতে পাঠাচ্ছে রাস্তায় স্টেশনে।

কিন্তু রহস্যেরই জটাজালের আড়ালে, নন্দ হাড়ীর জন্য প্রাণটা টনটন করতে লাগল রাজার। ছোট ভাইটার জন্য কান্না পেল। মায়ের কাছে ঘেঁষতে না পেয়ে বুকটা ফাটতে লাগল তার।

রাজা ওর প্রথম শেখা সুরটা বাজাতে লাগল; আমার এ জগতে কেউ নাই গো।

রাজা দেখল, নন্দর চেহারাটা গেছে শুকিয়ে। কাশে ঘং ঘং ক'রে। মুখের ওপর সেদিন মায়ের সাঁড়াশী ছুঁড়ে দেওয়া ক্ষতের দাগটা কোনদিন যাবে না নন্দর। কিন্তু ভাব হলে মা আর নন্দ হাড়ী তেমনি করেই হাসে।

একদিন নন্দ ডাকলে রাজাকে। বর্ষার গঙ্গা এপার ওপার ভরা-ভরতি। জোয়ার উজানে চলেছে উত্তরে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেরই মত পশ্চিমা পেল্লায় নৌকোর পালগুলি উড়ছে। রাণীর বাজারের ঘাটে অনেক নৌকো। কেউ যাবে কলকাতায় কেউ মগরা, পাণ্ডুয়া, আরো দূর বর্ধমান ছাড়িয়ে পশ্চিম দেশে।

নন্দ বললে রাজাকে বুকে টেনে, 'বাঁশীতে পাঁজরা খায় জানিস?'

রাজা বললে, 'তা বললেও আমি বাজাব।'

যেন তাকে বারণ করবে নন্দ, সেই ভয়। নন্দ বললে, 'সাবাস্! মা'র কাছে থাকিস।'

আকু কোনদিন ভয় দেখাতে পারেনি রাজাকে। কারণ, রাজা তখন হারাবার ভয় শেখেনি। নন্দর কথা শুনে তার বুকের মধ্যে চমকে উঠল। বলল, 'তুমি?'

নন্দ গঙ্গার বুকে তাকিয়ে বলল, 'চলে যাব।'

যেন ঝড়ে ডানা গুটনো চিলটা ডানা ঝাপটা দিয়ে, তার সবল গ্রীবা তুলে, আবার আকাশের দিকে তাকিয়েছে যদিও চোখে তার ক্লান্তির ছায়া।

রাজার ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল নন্দ, 'কিছু গড়তে পারলুম না, তোদের খাওয়াতে পরাতে পারতুম না, তাই পালাব।'

রাজার মুখটা নিজের বুকে ঘষে দিয়ে বলল, 'কাঁদিসনে রাজা। শোন্ তোকে একটা কথা বলি।'

রাজা মুখ তুলতে পারল না। জীবনে এইটি তার প্রথম শোক। নিজের বাবার মৃত্যুতে শোক পায়নি, দুঃখ পেয়েছে রাজা। কষ্ট হয়েছে। শোক অন্য জিনিস। মনের যেখানটায় কালের প্রলেপ সহজে পড়ে না। রাত্রি হলেই আকাশের তারার মত সে চিরদিন ধ'রে জ্বলে।

রাজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে।

নন্দর গলার শিরাগুলি ফুলে উঠল মোটা দড়ির মত। সেও কিছুক্ষণ ধ'রে ঢোক গিলল। বলল, 'শোন্ রাজা, একটা কাজের কথা শোন্। কেওরাপাড়ার শুয়োরগুলোন জানে না, মানুষ হ'লে জানতে হয়, সোমসারে চিরকাল কেউ থাকতে আসে নাই বাপ, বুইলি? মরণের বড়ো ভয় নাই, ভয় পাস না কোনদিন। নাম তোর রাজা। দেশের নয়, নিজের রাজা নিজে থাকবি। এই ছাখ্ না আমি কি ক'রে ফেললুম, পাঁচিটাকে ডোবালুম। সাধ ছেল, কিন্তু নিজের রাজা নিজে থাকতে পারলুম না। মনে মনে রাজা থাকবি। মন খারাপ হলে কষে বাঁশী বাজাবি।'

কাউকে উপদেশ দেওয়া নন্দর ধাতে নেই। কিন্তু রাজাকে সে তার মনের মত কথা কয়টি না বলে পারল না। কারণ, পাঁচির গর্ভে তার

ঔরসজাত সন্তানকে কোনদিন কোলে নিয়ে দেখেনি, আকুর ছেলে তার ছেলের চেয়ে বেশি।

জোয়ার বয়ে যায়। পশ্চিমা মাঝি ডাক দিলে, 'হেই হো বাঙালি মাঝি, জলদি আও, চল্না হ্যায়।'

নন্দকে ডাকছে। তাকে জড়িয়ে রাখা রাজার হাত দুটি ছাড়িয়ে সে বলল, 'যাই বাপ্।'

নন্দর কথা কতখানি বুঝল রাজা, কে জানে। সে ভেজা লাল চোখে তাকিয়ে রইল নন্দর দিকে।

মাঝির কাজ নিয়ে চলে গেল নন্দ। নৌকা চলে গেল উত্তরে, পূব দক্ষিণ কোণ্ ঘেঁষা বাতাস পেয়ে, পাল তুলে দিলে। দশ মাল্লাই নৌকা বদর বদর করে হারিয়ে গেল দূর বাঁকের মুখে।

মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে রাজা, সামনে পৃথিবী। মস্ত বড় পৃথিবী, কুল নেই কিনারা নেই। এত বড় পৃথিবীতে এবার কোথায় যাবে রাজা?

আশ্চর্য! রাণীর বাজারের চেয়ে পৃথিবী কত বড়! নন্দ চলে গেল, তাই যেন এ বিশ্বের বিরাটত্ব প্রথম অনুভব করল সে।

মায়ের কাছেই এল রাজা। রাণীর বাজারে কত বড় বড় ঘটনা ঘটে। সভা সমিতি হয়। পৌরসভার ভোট নিয়ে কত মারামারি হয়। প্রতিদিন কত ঠকানো, জোচ্চোরি, কতজনের পৌসমাস আর সর্বনাশের যুগপৎ খেলা হয়।

কেওরাপাড়ায় তাতে কারুর যায় আসে না।

শুয়োর আর একটিও নেই। ঝুড়ি ঝুপড়িতে পেট চালান দায়। বাঁশ বাখারি এনেই বা দেয় কে? পাড়া গাঁ থেকে বাঁশ বাখারি না নিয়ে এলে, শহরের গোলা থেকে বাঁশ কিনে, মালের পড়তা পড়ে না।

পাঁচি কেওরানির মাথা খারাপ হতে লাগল আবার। যেদিন সে বুঝতে পারল, নন্দ চলে গিয়েছে, সেদিন সে খুব কাঁদলে। একটি দিন পুরোপুরি কেঁদে, তারপর গঙ্গার জলের নিরন্তর যাওয়া-আসার দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস্ করে বলল, 'লোকে বোঝে না।'

এই লোক যে কে, যে কোনদিন কিছু বোঝে না, চেনা বড় দুষ্কর। এই লোকও সেই বিশ্ব-রহস্যেরই অঙ্গীভূত। যে কোনদিন কিছু বোঝে না। তার পায়ে মাথা কুটেও, তাকে কোনদিন কিছু বোঝানো যায় নি এ সংসারে। সে বোবা, কালা, অন্ধ।

পাঁচির মনে হয়, এ বিশ্বের সব মানুষের মধ্যেই এই লোকটি আছে, যে বোঝে না। সে গঙ্গার কাছে সেই কথাই বলল, নন্দ হাড়ীর জন্য যে তার প্রাণ পুড়বে, সেটা কেউ বুঝবে না। নন্দ হাড়ীও বুঝবে না। বুঝবে না, বালিকা বয়সে যে আকুর সঙ্গে কাটিয়ে সে আর দশটি মেয়ের মত জীবনের স্বাদ ভোগ করছিল, তার চেয়ে অনেক বড় পাওয়া হয়েছিল তার নন্দকে। সে পাওয়ার সুখ যত তীব্র, বেদনাও ততোধিক তীব্র। নন্দ তার বাঁধাধরার মানুষ ছিল না, মনের মানুষ ছিল। সে কাছে থাকলে সংসারের ধুলো লেগে যায় তারো গায়ে। তখন তাকে আর চেনা যায় না। সে চলে গেলে বোঝা যায়।

নন্দকে পেয়েছিল সে বীর্যশুল্কারূপিণী হয়ে। তাই, আপন রক্তের দাপট যে কত, সেটা সেঅতীতে টের পায়নি। বুকে যে মোচড় কতখানি লেগেছে, সেটাও কাউকে বোঝান যাবে না। তার এই প্রস্তরকঠিন শরীরে কালের রেখা পড়ল না আজো। চিরযৌবনের জোয়ার রয়ে গেল তার অনার্য সুঠাম অঙ্গে অঙ্গে। কিন্তু রক্তে আর তেমন করে আগুন জ্বলবে না কোনদিন।

পাড়ায় সবাই গাল দিলে নন্দকে। বললে, 'জানাই কথা, শত হলেও জাতে হাড়ী তো!'

যেন কেওরা হলেই নন্দ থেকে যেত।

নন্দর ঔরসজাত ছেলেটি মারা গেল।

রাজার পিঠে রোজ খানকয়েক করে কঞ্চি ভাঙতে লাগল পাঁচি। যেন তার জীবনের যত আপদ রাজা-ই। রাজার বাঁশীগুলির ওপর সবচেয়ে বেশী রাগ পাঁচির। মুরলীবাঁশ এনে এনে রাজা বাঁশী তৈরী করে, পাঁচি সেগুলি মট্ মট্ করে ভাঙে রাজার পাঁজরের মত, আর বলে, 'শোরের বাচ্ছা, ওর বাবাকেলে বাপের কাছে(নন্দর কাছে) কানাই-

বিত্তি শিখেছে।'

কানাইবিত্তির মানে সম্ভবত কৃষ্ণবৃত্তি। অর্থাৎ বাঁশী বাজানো।

পাঁচির প্রতি অসীম ঘৃণা এখন রাজার। আগেকার মারধোরের মধ্যেও একটা অন্য কিছু ছিল যেন, কাঁদলেই দুঃখ চলে যেত। এখন আর তা যায় না রাজার। সে ধুলো ছুঁড়ে মারে মাকে। সেও গাল দেয় মাকে সমানে সমানে।

মা যে কী কুৎসিত দেখতে, ঠিক ডাইনীর মত, ভাবলেই রাজার ইচ্ছে করে কাটারি দিয়ে মায়ের গলাটা কেটে দেয়। মা যে কেন মরে না! হে ভগবান, হে কেওরাদের ঠাকুর, হে মা গঙ্গা, মা কবে মরবে? কবে মরবে?

ভাগাড়ের শকুনেরা নাকি অন্তর্যামী। একমাত্র তারাই নাকি জানে। কে কবে মরবে। রাজা লক্ষ্য করে দেখেছে, শকুন সত্যিই যেন সর্বজ্ঞ। তাদের চাউনি, এদিকে ওদিকে ঘাড় ফেরানো দেখলে, বোঝা যায়, তারা সব টের পাচ্ছে। কিন্তু রাগ পড়ে গেলে, তখন আর মাকে তার তেমন খারাপ লাগে না। রাত হলে, এখনো মার কাছে আসতে ইচ্ছে করে। মার কাছে যখন আসতে ইচ্ছে করে, তখন আর মায়ের মরে যাওয়ার কথাটা সে ভাবতে পারে না।

কিন্তু পাঁচি এখন আর খেতে দেয় না রাজাকে। রাজাকে নিজের খাবার নিজেকেই সংগ্রহ করতে হয়। বাজারের ফড়েদের সঙ্গে সে দূর গ্রামে যায় মাল আনতে। ফড়ের অনুপস্থিতিতে গদীতেও বসে। কিন্তু সেখানে বিশ্বস্ত থাকবার উপায় নেই। পয়সা না সরিয়ে বিশ্বস্ত থাকলেও অবিশ্বাস এবং মার কপালে থাকেই। আর দু'পয়সা সরালেও, সম্পর্কের বড় একটা এদিক-ওদিক হয় না।

কিন্তু তবুও মা ছেলের আহার প্রতিদিন জোটে না। কেওরাপাড়ায় ক'জনেরই বা তা প্রতিদিন জুটেছে। কেওরা পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আসে পাঁচির কাছে। কিন্তু পেটে সন্তান আসার ভয়ে কাউকে আর পাত্তা দেয় না পাঁচি।

তবু একদিন রাত্রে, আবার দুটি পা এগিয়ে এল পাঁচির ঘরের

দিকে। সে পা ফাটা থ্যাবড়া থ্যাবড়া নয়, চকচকে জুতো। যে পালিশের ওপর রাণীর বাজারের প্রবৃত্তির ইতিহাস ঠিকরে পড়ছিল। জঙ্গল মাড়িয়ে নয়, পাদুকাশোভিত সে চরণযুগল এল রাণীর বাজারের ইতিহাসেরই স্বচ্ছন্দ সড়ক ধরে। তার ঠিকরে-যাওয়া পালিশ যেন কেউটের মল চকচকে, ক্ষুধার্ত জিহ্বা যেন লক্‌লক্ করছে। তার মস্‌মস্ শব্দে প্রবৃত্তির দাঁত পেষার নিষ্ঠুর খুশির ঘর্ষণ।

দরজা খুলে দাঁড়াল পাঁচি, চুলে যার খোঁপা বাঁধা, মুখে যার পান। চোখে যার তাড়ির নেশা লাগা জ্বলন্ত অঙ্গারের দপ্‌দপানি, নিঃশ্বাসে যার ঘরের অন্ধকারও বিষাক্ত।

বিশ্বরহস্যের প্রাণ সংলগ্ন সহজ মানবী পাঁচির আজ রূপান্তরের কান্নার দিন নয়। কিন্তু বিশ্বরহস্যেরই আর এক রূপান্তরের অসহ্য ঘৃণাটা বাকী থেকে গিয়েছিল। সেটাই আজ প্রাণ ভরে করলে পাঁচি সেজেগুজে, তাড়ি খেয়ে, সাটিনের সার্ট জড়ানো বুকে খিল্‌খিল্ হেসে ঢলে পড়ে। আজ শোক-সাজ-নবজন্মের আর এক দিন। বিশ্বরহস্যের যে দুয়ারটা আজ খুলেছে, সেখানে শূন্য হাঁড়ি, নেভানো উনুন, অভুক্ত জঠরের বিবেকহীন বাঁচতে চাওয়ার শুধু জীবযাতনা।

অশেষ ঘৃণা দিয়ে জড়িয়ে ধরল, মুখে মুখ দিয়ে হাসল পাঁচি স্বৈরিণী, নোনা ভাতের থালাটা শুধু জেগে রইল তার চোখের সামনে। কালো রায় যখন বেড়িয়ে এল, ভাইপো শম্ভু রায়ের পিটুলীতলা ভিটে পাঁচির ঘর থেকে, বাইরে তখন রাজা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

কালো রায় ভয় পেয়েছিল। বলল, 'কে?'

রাজা একেবারে হাঁ। কালো রায়কে চিনতে পেরে, ছেলেটা যেন বিশ্বরহস্য দর্শন করতে লাগল। কালো রায় একটি সিকি কিংবা আনি ছুঁড়ে দিল রাজার পায়ের কাছে। বলল, 'নে।'

বলে চলে গেল। পয়সাটা কুড়িয়ে নিল পাঁচি।

রাজা তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। মিথ্যে কৈফিয়ত দিয়ে গল্প খাড়া করার সুযোগ এখানে নেই। তার ধারও ধারে না কেউ। তবু রাজাটা যে কবে থেকে এমন গোঁয়ার হয়ে গেছে, টের পায়নি বুঝি

পাঁচি। ছোঁড়া মায়ের দিক থেকে সন্দেহ জিজ্ঞাসু চোখ দুটি নামালে না একবারো। তারপর ভাত রান্না করা পোড়া কাঠ দিয়ে দু' ঘা কষালে পাঁচি রাজাকে। বললে, 'যমের মত অমন তাকিয়ে থাকার কি আছে, অ্যাঁ? মায়ের সাঙা দেখছিস রে হল্লোৎ।'

রাজা আজ একেবারে রাজা। এমন একটা দুর্জয় প্রাণী যে ওর মধ্যে আছে সেটা আগে টের পাওয়া যায়নি। আগেই ভাতের হাঁড়িটা দিলে উপুড় করে ফেলে।

পাঁচি একেবারে বাঘিনীর মত চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল রাজার ওপরে। রাজা তখন পোড়া কাঠটা ছুঁড়ে মেরেছে মাকে। অব্যর্থভাবেই সেটা লেগেছে পাঁচির মাথায়। সে দিকে না তাকিয়ে রাজা জলের কলসীটা দিল আছড়ে ফেলে।

কাকে ধরবে পাঁচি? কাকে মারবে? একি পাঁচির রক্তে গর্ভেরই ঘৃণা ফুঁসে উঠেছে তার গর্ভজাতের মধ্য দিয়ে। সে যেন ভয় পেল। ভয়ে ও বিস্ময়ে রক্তারক্তি মাথায় হাত দিয়ে পাঁচি এই প্রলয় দেখতে লাগল। রাজা তখন বেড়ায় গোঁজা জিনিসপত্র মাটিতে ফেলে তছনছ করছে।

তারপর রাজা পালাল না ছুটে। ঘরের একটা কোণ নিয়ে দাঁড়াল মায়ের মুখোমুখি।

পাড়ার দু' একজন দেখতে এল ব্যাপারটা। গালাগালি চিৎকার তো আছেই। নতুন করে কিছু দেখবার নেই। তবু একটু বেশি মাত্রায় হচ্ছে বলেই কয়েকজন এল। এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে রাজার যে এই আসল কেওরার গুণ ফুটেছে এতদিনে, সে কথা বলাবলি করলে। কত বড় পাজী আর সর্বনেশে ছেলে, কত বড় ডাকাত আর ড্যাক্‌রা সেটা এতদিনে বোঝা গেল।

কিন্তু ছেলে কিংবা মা কারুর পক্ষ থেকেই যখন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, তখন সবাই চলে গেল। শুধু তারা নাকি বুঝতে পারলে না এরা সং, না এসব ঢং।

পাঁচি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কপালে হাত দিয়ে সে মুখ গুঁজে আছে বেড়ায়। ঘাড়ের কাছে আঁচলে তার রক্ত লেগেছে।

রাজাকে যেন কেউ যাদু করেছে। নড়তে পারছে না। একটু একটু করে নিভে এল ওর তার চোখের আগুন। একটু একটু করে চোখের সামনে ফুটতে লাগল ওর অবিশ্বাস্য খ্যাপামির তছনছ করা ছবি। তারপর ওর শরীরটা কাঁপতে লাগল। আর জল এল দু'চোখ ফেটে। সেও বেড়ায় মুখ চাপল।

এখনও রাজা কিছুই চাপতে শেখেনি।

তারপর ও শুনতে পেল মায়ের ভার ভার গলা, 'এই মুখপোড়া এখানে আয়, আয় বলছি।'

মায়ের এমনি ডাক কোনদিন রাজা অমান্য করতে পারে না। মায়ের দিকে না তাকিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। পাঁচির হাতের সীমানায় এল। পাঁচি যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। যেন রাজা তার অচেনা। পাঁচি যেন কঠিন গলায় হুকুম করল রাজাকে, 'আরো কাছে আয় মুখপোড়া।'

লম্ফর আলোয় রাজার ছায়াটা মায়ের গা ঘেঁষে দাড়াল। পাঁচি হাত বাড়িয়ে, রাজাকে এক হ্যাঁচকায় নিজের বুকে ঠেসে ধরে বলল, 'এখানে মুখ দিয়ে পড়ে থাক, নড়বি না। রাজা দু' হাতে মাকে জাপটে ধরে আবার ফুলতে লাগল।'

পাঁচি তাকিয়ে দেখল, রাজা তার বুক ছাড়িয়ে উঠেছে লম্বায়। চোখ তার জলে ভেসে গেল। দু' হাতে রাজার রুক্ষ মাথাটি জড়িয়ে ধরে বলল শুধু, 'মই, মলুই তুই!'

রাণীর বাজার দিনে জাগে, রাতে জাগে। রাণীর বাজার হিসেব করে, খুনোখুনি করে। রাণীর বাজার নানানভাবে হাসে, গান করে।

কিন্তু রাণীর বাজার কখনো কখনো মুখ লুকিয়ে না কেঁদে পারে না। তার নানান্ ডামাডোলের মধ্যে সে কান্না দেখা যায় না, শোনাও যায় না।

পাঁচি কেওরানি আর তার ছেলে রাজা কেওরার জন্য কেঁদেছিল সেদিন রাণীর বাজার। যাদের জন্ম-মৃত্যুর কার্যকারণ, হিসেবনিকেশ, যদিও নেই রাণীর বাজারে। কেঁদেছিল কারণ, রাণীর বাজারের

মহাকালেরও বুঝি মাঝে মাঝে বুক ফাটে নিজের যন্ত্রটা চালাতে চালাতে।

তবুও কালো রায় এল। কালো রায়ের লোকেরা এসে আবার শম্ভু রায়ের ভিটে থেকে, আস্ত আস্ত বেড়া তুলে এনে বসাল তার জায়গায়। দু' একখানা নতুন দরজা, নতুন টালিও এল কিছু। আকুর পুরনো ঠিকে-ভিটেয়, নতুন করে জীবনস্বত্বের পত্তন হল পাঁচি কেওরানির। বাঁশ দড়ির একটি খাটিয়াও এল। বোধ হয়, পাঁচি কেওরানির কাঁচামাটির মেঝেতে বসতে অসুবিধে হয় কালো রায়ের।

কথাটা কালোর ভাইপো শম্ভুর কানে গেল। কিন্তু সে আসেনি। শম্ভুর বয়স অল্প। বি. এ. পাশ করেছে। চাকরি করবার তার প্রয়োজন নেই। গোটা রাণীর বাজারে সে খ্যাতিমান ছেলে। কালো রায়ের বংশে নাকি সে প্রহ্লাদ। গরীবের অনেক উপকার করেছে। ন্যায়তীর্থের দৌহিত্র ন'কড়িকে তার গুরু বলা যায়। যদিও শম্ভু ন'কড়ির চেয়ে বড়। রাণীর বাজারের রাজনীতিতে শম্ভুরও কিছু শরিকানা আছে।

লোকে জানে, কালো রায়েরও শরিকানা আছে রাণীর বাজরের রাজনীতিতে। তবে সেটা অন্য হিস্যায়। সেকথা আসবে পরে।

শুধু কেওরাপাড়া থেকে শম্ভুর কাছে, কালো রায়-পাঁচি কেওরানির আপোষের সংবাদ যে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে বলে দিয়েছে শম্ভু, 'কালো বাবু যে দিন আবার পাঁচিকে তাড়িয়ে দেবেন সেইদিন আমাকে খবর দিতে বলো। পাঁচিকে আমি আবার জায়গা দেব।'

পাঁচির এই পরিবর্তনে পাড়ার অনেকে মুখ বাঁকাল। কিন্তু নীরবে কেউ কেউ বলল, 'এই বেশ হয়েছে। শত হলেও ওঁয়ার দিদিমাই তো আকুকে জীবনস্বত্ব দে' গেছলেন। ওঁয়ার সঙ্গে আপোষ হয়ে যাওয়াই ভাল।'

কিন্তু পাঁচি আর সেই পাঁচি রইল না। যদিও তার দালান কোঠা উঠল না, খাট পালঙ্ক হল না, গা ভর্তি গয়না হল না, জমিদারের

ট্যাক্‌সো তো মাপ্‌ হল। পেটের ভাতের ভাবনা তো গেল। পেট পুরে ভাত খেয়ে, দু বেলা দুটি পান মুখে দিয়ে, ঠোঁট রাঙ্গা করে তো পাঁচি লোকের সঙ্গে কথা ব'লতে পারবে। তা ছাড়া বামুন ভদ্রলোক বলে কথা। জমিরও মালিক। তার সঙ্গে আসনাই। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে বাবা! পাঁচি দূরের কথা, কার কথায় কে থাকে? কথায় বলে, 'তুমিও ভাল, আমিও ভাল, আর সব যেমন যেমন।'

তা ছাড়া মেয়েপাড়ার মত ব্যাপারটা নয়। সন্ধ্যের ঝোঁকে, পাঁচির দোরের দিকে একটু চোখ বুজে থেকো। কালো রায় এলেন কি গেলেন, কাকপক্ষীর জানারই কি দরকার। বামুন-কেওরা? তা সেও নতুন নয়।

এই অচ্ছুত পাড়ায়, রাণীর বাজারের মৃত্যুর খতিয়ান আছে অলিখিত গণনায়। আর এসব পাড়ায় যত প্রবৃত্তির অভিযান হয়েছে, সেই নতুন পুরনো হিসেবও কেউ ভুলে যায়নি।

কিন্তু তাকে প্রতিদিন মনে করে বসে আছে কে?

এ কথাও ভুলে যেতে লাগল সবাই। কানাঘুষো সব পাড়াতেই হল কয়েক দিন। আবার ভুলে গেল কয়েক দিনেই। শুধু যে কখনো ভুলতে পারে না, সেই নীরজা। এসব পরে, রাণীর বাজারে কালো রায়ের এবং কিরণবালার আবির্ভাব পর্বের কথা।

রাজা আসে অনেক রাত্রে। বেরিয়ে যায় ভোরবেলা। রাত্রে এসে, খাওয়ার পর রাজার যেটা আসল কাজ, সেটা হল বাঁশী বাজানো।

কালো রায়ের প্রথম দিন আসার পর থেকে, ও বিষয় নিয়ে রাজার সঙ্গে মায়ের আর কোন সংঘর্ষ হয়নি। আর কোন দিন মা ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেনি। পাঁচির যদিও অনেক কথা থাকে, রাজা একটা বিস্ময়কর গাম্ভীর্য নিয়ে শুধু হুঁ হাঁ দিয়ে যায়। মায়ের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখে না। পাঁচিই শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকে রাজার দিকে। বরং বেশী কথা বলতেই তার সঙ্কোচ হয় যেন। যেন সত্যি কেমন ভয় ভয় করে রাজাকে। আর ভয় করেও কেন যেন মনটা কোথায় ভরে যায় পাঁচির, নিজের জন্য তার ঘৃণাটা ওঠে বেজে।

রাজা গঙ্গার ধারে বাঁশী বাজায়। পাঁচি ঘুমোতে পারে না। নন্দ

হাড়ীর গানগুলি সার্থক বাজাতে শিখেছে রাজা। আকুর মরার দিনই মনসাতলায় পড়ে, প্রথম ভাল করে, মর্মমূল ভরে, নন্দ হাড়ীর বাঁশী শুনেছিল পাঁচি। আকুর চিতার অঙ্গার বুঝি জ্বলছিল তখনো। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, নন্দ হাড়ী তাকে ডাকছে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে।

অবুঝ রাজা সেই সুর বাজায়। কিন্তু নন্দ হাড়ী আর কোনদিন আসবে না ; শুধু ঘৃণার এক অদৃশ্য খাঁচায় সে বাঁধা পড়ে থাকবে চিরদিন।

পাঁচির সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে। রক্তে তার কি এক প্রলয়ের আগুন যেন জ্বলে। কিন্তু কিছুই পোড়ানো যায় না তাতে। শুধু নিজে জ্বলে পাঁচি। কালো রায়ের ভালোবেসে 'দেখতে ভাল লেগে' দেওয়া রূপোর কোমরবন্ধনীর রাহুবেষ্টন শত চেষ্টাতেও আর যেন ছিন্ন করা যায় না।

রক্তের জ্বালাতেই বুঝি, পাঁচির শরীর স্থূল হয়ে ওঠে। মোটা হতে থাকে সে, তারপর মোটা হতে হতে মাংসে চিড় খায়, ফাট ধরে, খসে খসে গলে গলে পড়তে থাকে।

রং-এর জল রং-এ মিশলে সহজে টের পাওয়া যায় না ; কিন্তু স্বচ্ছ জলে গোপন রাখা যায় না তাকে।

কেওরানীর তেজোদ্ধত, প্রকৃত নায়িকা-শুদ্ধ রক্তে. অতি দ্রুত আর ভয়ঙ্করভাবে কালো রায়ের রক্ত উঠল ফুটে।

কালো রায়ের দেওয়া খাটিয়াতেই শুয়ে মরল পাঁচি। মরবার আগে, সব অস্থিরতার পর যখন শান্ত হয়েছিল পাঁচি, যখন যন্ত্রণা দূরে চলে গেল, মৃত্যু তার শিয়রে হাত রেখে শেষ বারের জন্য পৃথিবীকে দেখে ও শুনে নিতে বলল, তখন পাঁচি রাজাকে ডেকে বললে, 'সেই গানটা না কি রে রাজা যেটা সে বাজাত ?'

নন্দ হাড়ীর কথা বলল পাঁচি। গানটার কথা রাজাকে বলেছিল নন্দ। পাঁচিকেও অনেকদিন বলেছে। রাজা বলল ঃ

'সখি যাবার কালে, কেন ডাকিলে
ভবেতে বড় দুখ গো
নির্বাণ নগরে যেতে মন করে
সেথা বড় সুখ গো।'

পাঁচির দৃষ্টি স্থির। বলল, 'আর এল না। শোন, রাজা। কাছে আয়।'

রাজা কাছে গেল। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে, একটু বুঝি অভিমান হল পাঁচির।

আর কোন কথা সে বলেনি। রাজা বলল, 'কি বলছিস মা?'

বুড়ো ও অন্ধ মুনি কেওরা বলল, 'আর কিছু বলবে না তোর মা।'

মারা গেল পাঁচি।

সবাই মুনি কেওরার দিকে তাকাল সভয় বিস্ময়ে।

কিন্তু পাঁচি তখন সত্যিই মারা গিয়েছে।

ইতিহাসে রাণীর বাজারের নাম নেই। কিন্তু রাণীর বাজারের ইতিহাসে, এরকম অনেক পাঁচি কেওরানি মরেছে। যুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে, আজকেও মরছে। কিন্তু রাণীর বাজারের ইতিহাসে নাম লেখাবার কোন দাবী তাদের নেই।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল কবেই। অনাহার ও মড়কের থাবাটা নেমে এসেছে রাণীর বাজারেও।

রাজা প্রথমে গেল শম্ভুর কাছে।

শম্ভুর তখন মন খারাপ। নকড়ি ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। শম্ভু বি. এ. পাশ করে বেরিয়েছে। তবু রাজনীতিতে গুরু তার ন'কড়িই। শম্ভু যখন ভাবছে, ইংরেজকে যুদ্ধে বাধা দেওয়াই সঙ্গত, নকড়ি তখন উল্টো কথা বলছে। বলছে, 'শম্ভুদা সোজা আঙুলে ঘি ওঠাতে যেও না। রাজনীতির পথটা অত সোজা সোজা মারের পথ নয়। ভাবছ, আমাদের শত্রু বে-কায়দায়, তা মোটেও নয়। যে দুর্দিনটা এসেছে, তাতে এখন ইংরেজদের সঙ্গে আখেরি মিটমাটের সময় আমাদের নয়। দুর্ভাগ্যের হলেও পথ গেছে বেঁকে ঘরের শত্রুর সঙ্গে এখন আমাদের সন্ধি রাখতে হবে।'

এরকম উল্টোপাল্টা কথায় শম্ভু অস্থির ও বিব্রত।

সেই সময় একদিন রাজা এল। ন'কড়িও ছিল তখন।

শম্ভু বলল, 'কি রে ?'

রাজা বলল, 'মা মারা গেছে দাদাবাবু।'

শম্ভু চিনতে পারলে না, 'কে তোর মা ?'

'কেওরাপাড়ায়—'

'ও, পাঁচি ? হ্যাঁ, শুনেছি।'

কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে রইল শম্ভু। পাঁচির কথাই ভাবছিল সে। কারণ তার মৃত্যুর কাহিনী তাকে সাড়ম্বরে শুনিয়ে গিয়েছে কেওরাপাড়ার লোকেরা। শম্ভুর চোখের সামনে ভেসে উঠল, তার কাকীমার মুখখানি। রাণীর বাজারের পথে বেরুতে যার লজ্জা।

শম্ভু বলল, 'কি বলছিস, বল।'

রাজা শম্ভুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল, দাদাবাবুর রাগ আছে কি না। বলল, 'আপনার কাকার ভিটেয় আমি থাকব না দাদাবাবু। আপনার পিটুলীতলার জমিতে আমি থাকব।'

শম্ভু অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে ?'

রাজা মুখ নামিয়ে বলল, 'দাদাবাবু, মার জন্যেই ও ঘরে ঢুকেছি। মরবার জন্যেই মা ঢুকেছিল ওখেনে। আপনি যদি জায়গা না দেন, তবে ইষ্টিশনে পড়ে থাকব।'

শম্ভু আর ন'কড়ি চোখাচোখি করল। অন্ত্যজপাড়ার ছেলের মুখে এমন কথা, এই তারা প্রথম শুনলে যেন, শম্ভু তবু বলল, 'কিন্তু ওখানে থাকতে আপত্তি কি ? তোর বাপ মরেছে ও ঘরে, তোর মা মরল।'

রাজার দুই চোখে আগুন দেখা গেল। কালো রায়ের বাড়িটাও দেখা যাচ্ছিল শম্ভুর বৈঠকখানা থেকে। সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল রাজা, 'বড় ঘেন্না করে দাদাবাবু।'

শম্ভু আর ন'কড়ির তখন বয়স অল্প। রাজাকে তাদের আশ্চর্য ছেলে বলে মনে হয়। তাকে ওরা বসতে বললে। খেতে দিলে আর রীতিমত অন্তরঙ্গ স্বরে কথা বলে বুঝিয়ে দিলে, রাজা তাদের বন্ধু-স্থানীয়। নকড়ি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বয়স কত ?'

'পনর।'

শম্ভু বলল, 'আমার মাকে আর কিছু বলিসনে যেন। ঘর তুলে নে গিয়ে। ঠিকে সত্ব লিখিয়ে নিলেই হবে এক সময়ে। ঘর তুলে নিল রাজা। কিন্তু বাঁশীর মতনই ন'কড়িদের সঙ্গটা আর ছাড়তে পারলে না সে। যদিও দিন কেটে যায় পেটের ধান্দায়।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সরকার বদলাল। রাজা চাকরি পেল চটকলে। কিন্তু বেশীদিনের জন্যে নয়। ন'কড়ির যন্ত্র ছিল তার কানে। ধর্মঘট করতে গিয়ে, আরো তেরজনের সঙ্গে তার চাকরি গেল। সাতদিন রাণীর বাজারের থানায় হাজতবাসও হল রাজার।

কিন্তু পেট? সে তো কোন কথা শুনতে চায় না। তাকে ভরাতেই হল। ভাগ্যের কল কি ভাবে চলে, কে জানে। নন্দ হাড়ীর মত রাজাও রাণীর বাজারের খেয়াঘাটে মাঝির কাজ আরম্ভ করল।

সেই সময় জীবনরহস্যের আর একটি দুয়ার খুলে গেল রাজার সামনে। মুনি কেওয়ার নাত্‌নি, গণেশ কেওরার মেয়ে ছেউটি, তার বাঁশীর সুরে তাল দিয়ে একদিন হেসে উঠল গঙ্গার ধারে।

সন্ধ্যার কোল আঁধারে, শাড়িতে গাছকোমর বেঁধে মেটে কলসী কাঁখে এসে একদিন দাঁড়াল ছেউটি, জোয়ারের জলে পা ডুবিয়ে।

অদূরেই, জানোয়ারের শব ঘিরে, শকুনেরা রাত্রি অবসানের ধ্যান করছে। রাত কানা শবভূকেরা তাদের তীক্ষ্ণ চোখ নিয়েও এখন অসহায়। প্রকৃতির কাছে ওইখানেই তারা কাবু হয়েছে।

রাণীর বাজারের সঙ্গে দিনে রাত্রে পাল্লা দিয়ে, তারাও আসর জাগিয়ে রাখতে পারে না।

হাড়গোড় কঙ্কাল মিলিয়ে, এ মৃত্যুলীলার মাঝখানে, হাড়ী কেওরা ডোমেরা মাটি নিকিয়ে, গোবর লেপে, ঝাঁট দিয়ে নিজেদের চলার বসার জায়গা ঠিক করে রাখতে পারে। এ মৃত্যুলীলার মাঝেই তাদের বাস, তাদের যত হাসিকান্নার খেলা।

কেওরাপাড়ার গঙ্গাধারে পৌরসভার টিমটিমে বিজলী বাতি জ্বলে। কেওরাপাড়ার তাস আর 'ষোল ঘুটি বাঘ চাল' আসর বসে লাইটপোস্টের তলায়। আলো নাকি খুবই দ্রুতগামী, যদিও নাকি

মনের মত নয়, তবু কেওরাপাড়ার বিজলী আলো উঁচু পাড় থেকে মাঝখানের ঢালুতে আসতে আসতেই নিস্তেজ হয়ে আসে। তারপর যে অন্ধকার, সে অন্ধকার।

লাল কলসী কাঁখে সেদিন এল ছেউটি। ষোল বুঝি পার হয়ে যাব যাব করছিল তার। নামে ছেউটি হলেও শীতের সেই ছেউটি গঙ্গাটি নেই আর মেয়ে। আষাঢ়ের ঢল নেমে গিয়েছে, রক্তস্রোত আবর্তিত হয়ে অম্বুবাচির মুক্তিস্নান শেষে দিগদিগন্ত আকুল হয়ে গিয়েছে।

খাটো ডুরে শাড়িটিতে, আর তেমন করে ছেউটি নিজেকে আড়াল করতে পারে না। রং একটু কটা। কেওরার ঘরে তার অভাব নেই। ন্যায়তীর্থের শাস্ত্রসম্মত সব সুলক্ষণ না মিলুক, কেওরার ঘরে ছেউটির নাক একটু উঁচুই, অর্থাৎ সুউন্নত বলা যায়। জংঘা ও উরু যুগল শিব-কোল-লগ্ন উমার মতই গুরু ও সুঠাম। চুলের কুঞ্চন যদিও কুলক্ষণ, কেওরার ঘরের এ আদিরূপটুকু ছেউটি পার হয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু চোখ বিশালই। যদিও ছেউটির চোখের মণি কালো নয়, কটাও নয়, কটাসে। বক্ষস্থল যদিও বিশাল ও মুনি-ধ্যানচুর্ণী, তবুও ঈষৎ নম্রতার অবকাশ এখনো আসেনি শুয়োর পিটিয়ে খেটে খাওয়া ছেউটির। ছেউটির রূপসী বলে নাম আছে কেওরাপাড়ায় তাই গণেশ কেওরার পণের ডাক কিছুই কম নেই।

কেওরানি পণ-শুল্কা।

ছেউটি বড় হয়েছে, ঘর ও শ্রেণী হিসেবে একটু বেশিই। আজকাল তাই হচ্ছে, কারণ কালের হাওয়া লাগে সবখানেই। রাণীর বাজারের ঘাটের নীলামের ডাকের মত, পণের ডাক বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত চড়া ডাক বজায় রেখেছে বেচু। ব্যাচা কেওরা। আশেপাশের কেওরাপাড়ায় খবর চলাচল চলছে। খুব চড়া ডাক এলেই তো খালি হবে না। ডাকওয়ালাকেও দেখতে হবে। কারণ, মেয়ে বলে কথা।

আরো খবর গিয়েছে রাণীর বাজারে প্রবৃত্তির রংমহলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ছেউটি কেওরানীর রূপ নাকি আর ধরে না।

সেই ছেউটি একদিন চমকে দিল রাজাকে।

ঘাট-মাঝির কাজ থাকার কথা তখন। কিন্তু রাজার রক্তে মাঝি নেই। হাল ছেড়ে বাঁশীতে তার মন বেশি। নন্দ হাড়ীর মতই, রাজা জীবনের দায়িত্ব থেকে খালাস পেয়ে বাউণ্ডুলে বৃত্তির পথে এসে পড়েছে কবে। এখন কেবল দুটি জিনিস সে ছাড়তে পারবে না। বাঁশী, আর ন'কড়ি ঠাকুরের ডাক। বুদ্ধি দিয়ে জীবনচর্চা করে সম্ভব নয়, তাই হৃদয়বৃত্তি দিয়ে ন'কড়িকে সে তার ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছে। বাঁশী তো তার নিঃশ্বাসেই কথা বলে।

তাই, নন্দ হাড়ীরই আশসেওড়া আকীর্ণ উঁচু ঢিবিতে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল রাজা। একটা অশরীরী অনুভূতিতে সে চমকে উঠল ছেউটির হাসির কিঙ্কিনী শুনে।

বাঁশী থামিয়ে, কয়েক মুহূর্ত লাগল রাজার ছেউটিকে আবিষ্কার করতে। বাঁশীর সুরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নানান বিশ্বরহস্য যে ছদ্মবেশে ফুটে ওঠে তারই কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটল কি না, চকিতে একবার সে সন্দেহও উঁকি মেরে গেল রাজার মনে।

জলের ধারে, কোল আঁধারে ছায়া দেখে রাজা বলল, 'কে?'

ছেউটি জবাব দিল না। তার লাল কলসীর মুখ ডুবিয়ে জোয়ারের জল ঢুকতে ঢুকতে শব্দ উঠল, ডুব্ ডুব্ ডুব্। তারপর কেওরা মেয়েদের প্রিয়, দক্ষিণের শোলাঘাটের ধমকি বুড়ি চুড়িওয়ালীর, কাচের চুড়ি বেজে উঠল ঠুন্ ঠুন্ করে।

রাজার মনে হল, কেওরাপাড়ার ঘাটের সেই চিরকালের রূপকথার স্বপ্ন দেখছে বুঝি সে। বলল আবার, 'কে গো?'

ছেউটি বলল, 'ভূত!'

গলায় হাসি ও ঠাট্টার আভাস পেয়ে নেমে এল রাজা তার ঢিবি থেকে। যদিও অবিশ্বাস্য, তবু এই ঘোর সন্ধ্যেয়, ছাড়া চুলে ছেউটি কেন ঘাটে? বলল, 'ছেউটি না?'

ছেউটি বলল, 'নজর করে দেখে নাও, ঘাড় মটকানী ডাইনী কিনা!' বলে আবার হাসল ছেউটি।

ছেউটিই। গণেশ কেওরার রূপসী মেয়ে, এখন যে চড়া ডাকে

আছে। পাড়ার মেয়ে, চলতে ফিরতে অনেকবার দেখাদেখি হয়েছে। যখন হয়েছে হয়ত তখন, ঠিক তখুনি মনের কোথায় যেন খচ্ করে উঠেছে এক-আধবার। একবারের বেশি দুবার ফিরে দেখতে হয়েছে। ছোঁড়া বুড়ো, সকলেরই অমন হয়। তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এ রকম করে দেখা আর কখনো হয়নি। হওয়া উচিতও নয়।

কেওরাপাড়ায় সরকারি জল কল আছে। বাসন মাজা আর ফালতু জল ছাড়া মেয়েরা কলসী ডোবাতেও বিশেষ আসে না। যদি বা আসে, তবে এমন অসময়ে নয়। অসময় যদি হয়, সঙ্গিনী থাকে। সঙ্গিনী থাকলেও অমন আবাঁধা চুল, আর ছেউটির কোমর ছাপানো চুল, এরকম এলো করে কেউ সন্ধ্যেবেলা আসে না।

মানুষও জীবজানোয়ারের মৃত্যুমঞ্চের আঙ্গিনায় বাস করে বটে, কিন্তু অপদেবতার ভয় আছে সকলেরই। রাজা তাকিয়ে দেখল, ছেউটির ফুলো ফুলো ঠোঁট দুটির কোণে, সংসারের রহস্য কি একটা খেলা খেলছে। জলের অতলে জানা না-জানা রহস্যের মত বড় বড় চোখ দুটিতে, কি যেন এক ভাবের খেলা।

রাজা বলল, 'এমন অসময়ে জল নিতে এয়েছিস ছেউটি ?'

ছেউটি বলল, 'ইচ্ছে হল, তাই।'

রাজা যেন বেআক্কেল হয়ে যায়। ছেউটি যেন কেমন করে কথা বলছে, না ? বলল, 'তা এমন আঘাটায় এলি, ঘাট থাকতে ?'

ছেউটি কথাও জানে। বলল, 'যেখানে জল, সেখেনেই ঘাট। নিতে পারলেই হল।'

'হুঁ।' রাজার মনে হল, তার বাঁশীর সুরের চেয়ে ছেউটির রহস্য কম নয়। কিন্তু বেচা কেওরার পণের ডাক চড়ানো মেয়ে, রাজার কাছে এমন করে দাঁড়িয়ে রইল কেন। চলে যাক্। না গেলে যে রাজা বোকা হয়ে পড়ছে। ধন্দ লেগে যাচ্ছে তার।

রাজা বলল, 'হাসছিলি কেন ছেউটি ?'

ছেউটি বলল, 'তোমার বাঁশীর গান শুনে, কি গান বাজাচ্ছিলে ?'

যেন বিমূঢ় হয়ে রাজা পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'কি গান বাজাচ্ছিলুম ?'

ছেউটি বলল, 'ওই তো, সেই

ও কালা কী জ্বালা তোর বাঁশীতে
সারাদিন রাধা কাঁদে যমুনারি পাড়েতে।'

বলল, 'তাই না ?'

রাজার ধন্দ বাড়তে লাগল। মা চলে যাবার পর, সংসারের একটা কোণ যে একেবারে ফাঁকা, সেটা যেন বড় বেশি করে মনে পড়তে লাগল তার। বলল, 'সুর জানিস বুঝি ছেউটি ?'

ছেউটি বলল, 'সুর জানব আবার কেমন করে ? চেনা সুর, তাই বললুম। পরশুকেও এই গানটা বাজাচ্ছিলে, না ?'

রাজা বলল, 'তুই শুনেছিলি বুঝি ?'

ছেউটি বলল ঠোঁট কুঁচকে, 'শুনব না ? রাত নেই, বিরেত নেই, তোমার বাঁশীর জ্বালাতনে কাজ করবার যো আছে নাকি ?'

'রাগ হয়, না ?'

ছেউটি এবার ভ্রূ কোঁচকাল। বলল, 'হলে কি করবে ?'

রাজা বলল, 'তোর মন রাখতে দূরে গিয়ে বাজাব।'

'তবু যদি শুনতে পাই ?'

'আরো দূরে যাব।'

তখন ঠোঁট উল্টে বলল ছেউটি, 'তাই যাও। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে শুনে শুনে। না বাজলেও আমার মনে হয়, সন্জেবেলায় বাঁশী বাজছে। তার কি হবে ?'

তাও তো বটে। বিশ্বরহস্যের এত অন্ধি-সন্ধি তো ভেবে দেখেনি রাজা। খালি বাঁশীই বাজায়। না বাজালেও ছেউটি শুনতে পাবে, এমন করে তার বাঁশী শোনার কথা তো রাজা জানে না।

রাজার যেন টনক নড়ে গেল। আর, এই বাউণ্ডুলে রক্তে একবার টনক নড়লে রক্ষে নেই। মরণের এই অগ্নিলীলা ক্ষেত্রে পোড়া শক্ত প্রাণে আগুন একবার লেগে গেলে, সহজে সে নেভে না।

বলল, 'তবে তোর কানের কাছে গে বাজাব ছেউটি।'

ছেউটি তার বড়ফাঁদ কটাসে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'আহা।'

বলে হাঁসের মত ঘাড় ফিরিয়ে, উঁচু পাড়ের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'সর পালাই।'

রাজা তখন কলসীতে হাত দিয়েছে। ভরা কলসী ছেউটির কাঁখাল থেকে নামিয়ে নিল, মাটিতে রাখল রাজা। রেখে ছেউটির হাত টেনে ধরল। ছেউটি হাত টানল, কিন্তু তেমন জোর পেল না। আঁশসেওড়ার অন্ধকার ঝোপে, কাঁচের চুড়ি ভাঙার শব্দ একটা অশরীরী মোহের সঞ্চার করল।

ছেউটি বলল ভ্রূ কুঁচকে, 'এ কেমন ব্যাভার হচ্ছে?'

রাজা বলল, 'তোর কথার মতন।'

পাঁচি কেওরানির শক্ত শরীরের বাঁধন, রাজার পুরুষ শরীরে সবল ও পেশল হয়ে উঠেছে। শক্ত হাতে রাজা টানল ছেউটিকে। ছেউটি জোর করতে গিয়ে, রাজার বুকের কাছে এসে পড়ল।

একটু যেন ভয় ভয় সুরে বলল ছেউটি, 'সর, কেউ দেখতে পাবে।'

রাজা বলল, 'এ সময়ে এ আঘাটায় আসতে তোর সাহসে কুলিয়েছে ছেউটি, আর কোন মামদোও আসতে সাহস করবে না। কিন্তু ছেউটি, আমার বাজান কবে থেকে শুনছিস্, বলে যা।'

ছেউটির গা কাঁপছে না, কেওরানির রক্তে ভয় নেই। বলল, 'অনেক দিন থেকে।'

রাজা বলল, কিন্তু, 'বেচা কেওরা চড়া পণ হেঁকে বসে আছে যে?'

ছেউটি পরিষ্কার বলল, 'তুমিও হাঁক।'

রাজা বলল, 'ছেউটি, বাঁশী বাজাতে পারি, ওটা আমার মিনি মাগনা। জানের দামে বাজে ওটা। কিন্তু পণ হাঁকব কেমন করে? দশ বিশটা শুয়োর নেই আমার, টাকা কই?'

ছেউটি বলল, 'তবে আমি কি করব? বাপকে চেন না? গলা কেটে নেবে আমার।'

কিন্তু রাজা বুকের পেষণ আরো শক্ত করে বলল, 'তবে এ আঘাটায় কোন্ র‍্যালা করতে এলি?'

ছেউটি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল রাজার মুখ। সেই চিরকালের

সুর ধরে বলল, 'তা আমি কি জানি?' বলে হাসতে লাগল।

রাজা বলল, 'তুই কি জানিস মানে?'

ছেউটি ধমক দিলে এবার। বলল, 'তোমার মুণ্ডু। তোমারই বা অত বাজাবার ঘটা কিসের শুনি?' বলে কলসী কাঁখে নিয়ে এগিয়ে গেল ছেউটি।

রাজা পিছু নিতে গিয়ে থামল। বোঝা যায় না লোক আছে কি না আশেপাশে। থাকলে দেখতে পাবে। রাজা ডাকল, 'এই ছেউটি।'

'কি?'

'আবার আসিস।'

'মরতে?' চলে গেল ছেউটি।

পাঁচি কেওরানির বার্তা নিয়ে একদিন শান্তনুর যে গঙ্গা সমুদ্রে গিয়েছিল, সেই গঙ্গাই আজো ছেউটি কেওরানি আর রাজা কেওরার কথা নিয়ে তলে তলে ছুটে গেল দক্ষিণে।

সেদিন আমি দেখছিলাম আমার চিলেকোঠা থেকে, রাণীর বাজারের আকাশে তখনো একটা তেরছা কালো রক্তমেঘ বাঁকা ঠোঁটের হাসির মত দেখাচ্ছিল। আকাশটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল। রাণীর বাজারের আকাশজোড়া মহাকালের মুখটা আমি পরিষ্কার দেখতে পাইনি। কিন্তু থ্যাঁতলানো রক্তমাখা ঠোঁটের মত ধনুকাকৃতি বক্রহাসি মেঘ আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

আরো দেখেছিলাম, ছেউটি মরতে এসেছিল আরো অনেকবার, রাজার উঁচু ঢিবির কোলে। কিন্তু কেওরাপাড়ার টনক নড়ে গেল। কেওরানি জেগে উঠেছে, কপাটে হুড়কো দে, সামলা।

তবে বেচা কেওরা যেমন তেমন লোক নয়। ঘরে নাকি তার টাকা আছে। থাকবার কথা। নোংরা বিষ্ঠা মানে না, শুয়োরদের সঙ্গে শুয়োরের মত থাকে বেচা। লাভের টাকা তার আছে। যুদ্ধের সময়ে কিছু জমিয়েও রেখেছে।

বেচার টাকা আছে প্রমাণপত্র সাবুদ আছে তার কানে ও হাতে। কানে আছে সোনার মাকড়ি। মোটা কালো হাতে আছে রূপোর বিছে

তাগা। তাগা অর্থে মাদুলি, সন্ন্যাসীর দেওয়া কু-নজর খেকো মন্ত্র ওষুধি। বেড়ার ঘর বটে, কেওরাপাড়ার মধ্যে আর কারুর পাকা ইটের মেঝে নেই। একদিনও গায় দেয়নি বটে, কিন্তু চায়না সিল্কের পাঞ্জাবি আছে বেচার। দশ হাত ধুতি আছে তোলা তিন তিনখানি, আর যুদ্ধের সময় এক সাহেবের দেওয়া বুট জুতো এখনো একেবারে নতুন রয়েছে তোলা।

টাকা কোথায় আছেসে কথা বেচা বলবে না। কিন্তু একশো পঁচিশ টাকা নগদ পণ সে হাতে গুণে দেবে গণেশ কেওরার। দুটো শুয়োর মারবে, বালাম চালের ভাত খাওয়াবে পাড়ার সবাইকে। এর একটাও যদি কম হয় তবে যেন মেয়ে তুলে নিয়ে যায় মেয়ের বাপ ঠাকুর্দা। মাথার ওপরে নাকি ভগবান আছেন, বাজে কথা বেচা বলবে না।

তা ছাড়াও বেচার আরো গুণ আছে। নিজের মুখে নিজের গুণ-কীর্তন না করলেও, পাড়ার সবাই সেই গুণের কথা রোজ শুনতে পেয়ে থাকে। বেচা ভাল ঢোলক বাজাতে পারে।

সত্যি বেচা ভাল ঢোলক বাজায়। পাড়ার কোন গানের আসর হলে, দোলের সময় সং বেরুলে, বেচা কেওরা ঢোলক নিয়ে উপস্থিত থাকবেই। তা ছাড়া, রোজ সন্ধ্যেবেলায় তো আছেই। কয়েক পাত্র তাড়ির পর, মনসাতলায় বসে বক্ বক্, নইলে ঘরে বসে ঢোলক পেটানো, এই আছে। সারাদিন তো শুয়োরের খেতমত খেটে খেটেই কাটে।

লোকবলও আছে বেচার। সময় মত তার সঙ্গ পাওয়া গেলে তাড়িটা ফুলুরিটা পাওয়া যায়।

কেওরানি পণ-শুল্কা।

সে হিসেবে বেচা আদর্শ।

তাই, ছেউটির সঙ্গে রাজার নামটা শুনেই, পোষা শুয়োর হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে যেমন একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে, ভাবলেশহীন ছোট ছোট চোখ দুটিতে পাশ কাটাবার ছল্ খোঁজে, ঠিক তেমনি করে বেচা একটা মতলব ঠাওরাল। যদিও কালো রায়ের

ভিটে থেকে রাতারাতি শম্ভু রায়ের ভিটেয় চলে যাওয়া, ন্যায়তীর্থের দৌহিত্র ন'কড়ি ঠাকুরের সাকরেদি করা, পুলিসকে ভয় না খাওয়া, সাতদিন হাজত বাস করা, তাও পরের একটা শুয়োর চুরি করে কিংবা মেরে, অন্যরকম ছেঁচড়ামি করে নয়, এই সব মিলিয়ে রাজার একটা ইজ্জত আছে পাড়ায়। রাজার শুয়োর নেই, পণ দেবার টাকা নেই, তবু রাজার একটা রাজা-গিরি আছে যেন কোথায়।

সেইটি বেচার ভয়ও বটে, আবার খচ্খচানিও বটে। এই ইজ্জতে রাজা ওপরে আছে! শুধু বাঁশী নয়, বুকে হাত দিয়ে বলুক যত বিয়ের যুগ্যি আইবুড়ি কেওরানিরা ইজ্জতের জন্যেও তারা রাজাকে চায় কি না চায়।

কিন্তু ছেউটি পণ-শুল্কা।

তবু বেচা পেঁয়াজ মুড়ি তাড়ি খাইয়ে, একটা পঞ্চায়েত ডাকলে। বিশ্বাস নেই। রাজাকে ডাকা হল। ছেউটির কোন প্রশ্ন নেই সেখানে। কিন্তু সবাই এক বাক্যে ঘোষণা করলে, পাড়ায় ঘরে মেয়েমানুষ নিয়ে বাস। সকলেরই ভালমন্দ নিয়ে চিন্তা করতে হয়। রাজা বাঁশী বাজাতে পারবে না আর।

বেচা ঢোলকটা নিয়েই বসেছিল। একজন এক একটা কথা বলে বেচা ঠাস করে ঢোলকে চাটি মেরে বলে, 'হ্যাঁ।'

রাজা খানিকক্ষণ চুপচাপ শুনলে সকলের কথা!

গোবিন্দর মা বুড়ি বললে, 'মিছে বলব না বাবা, আমি এক ছেলের মা, রাড়ি মেয়েমানুষ, ও ছোঁড়ার বাঁশী শুনে কত দিন পাতের ভাতে পা দিয়ে উঠে পড়েছি। অধম্মতো করতে পারিনে। শ্রীকৃষ্ণের মা যশোদা ঠাকরুণ বাঁশীর সুর শুনলে খেতেন না। গোবিন্দর মা পারে কেমন করে? পঞ্চায়েতকে এটা বিবেচনা করতে হবে।' যদিও গোবিন্দর মা বাড়া ভাতে পা দিয়ে উঠে পড়েও রাজাকে কোনোদিন একটি কথাও বলেনি।

রাজার ছোট ছোট চোখে বাঘের নজর। বলল, 'গোবিন্দর মাথা খেয়ে বলছ তো।'

বুড়ি হাউমাউ করে উঠল। ঢোলকটা গলায় নিয়েই লাফ দিয়ে উঠল বেচা। চিৎকার করে বলল, 'বলবে সত্যি কথা তার আবার দিব্যি গালাগালি কিসের ?'

রাজা তাকিয়ে ছিল বেচার দিকেই। নীচু গলাতেই বলল, 'শোরের মত চেঁচাসনি বেচা।'

বেচা লাফিয়ে বেড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'কি, শুয়োর বললি তুই আমাকে ?'

সবাই একযোগে হাত তুলে চেঁচিয়ে থামাল বেচাকে। ছেঁউটির ঠাকুর্দা, অন্ধ বুড়ো মুনি কেওরার গলা শোনা গেল, 'গোবিন্দর মার এতদিন বলা উচিত ছিল রাজাকে। জানাতে তো হয় একদিন।'

ছেঁউটির বাবা তার আগেই হাঁক দিল, 'তুমি থাম।' তারপর আরো শোনা গেল, 'তা ছাড়া বাঁশী বলে কথা। সাপখোপ আসতে পারে। পাড়ায় যদি কাউকে সাপে কাটে, তবে তার দায়ী হবে রাজা ?'

আর, শাস্ত্রের কথা, বাঁশী শুনলে মানুষের মন উচাটন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মেয়েমানুষের। কলিকালে মানুষ কিছু মানে না, কিন্তু ও যন্ত্রটি তো ভগবানেরই। এখন, যার বাঁশী তার ষোলশো মেয়েমানুষ থাকতে পারে, কারণ সে মানুষ নয়। কিন্তু রাজা মানুষ শুধু নয়, কেওরা।

সুতরাং পাড়ার মঙ্গলের জন্য, মেয়েমানুষদের রক্ষা করবার জন্য, পঞ্চায়েত সাব্যস্ত করেছে, রাজা বাঁশী বাজাতে পারবে না। এতক্ষণ রাজা এ বিষয়ে একটি কথাও বলেনি। এবার সে মুখ খুলল। বলল, 'কোন আইনে ?'

'কোন আইনে মানে ?'

রাজা বলল, 'কে আইন করে দিলে যে আমি বাজাতে পারব না।'

বেচা চেঁচিয়ে উঠল, 'পঞ্চেতের আইনে, হ্যাঁ, পঞ্চেতের আইনে।'

'পঞ্চেতের আইন আমি মানতে যাব কেন ? সে আমাকে খাওয়ায় না পরায় ? বাঁশী বাজাব, নিজের মনে বাজাব, তার আবার সভা

পঞ্চেতের কি আছে? বাঁশী আমি বাজাব।'

বেচা চিৎকার করবার আগেই ঢোলকে চাঁটি মেরে নিল। বলল, 'খবরদার, পঞ্চেতের বে-ইজ্জত সইব না! পাড়ায় থাকতে গেলে, পঞ্চেতের কথা মানতে হবে। নইলে, পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

বেচা তখন রাজার সামনে এসে পড়েছে। মনসাতলায় রীতিমত উত্তেজনা। বেচাকে সবাই সামলাতে ব্যস্ত। 'শোন বেচু, ঝগড়া বিবাদ করনিকো বাবা।'

বেচা তবু চিৎকার করে, রাজার মুখের সামনে এসে বলতে লাগল, 'চলে যেতে হবে পাড়া থেকে।'

রাজা দাঁতে দাঁত পিষছে। ছোট ছোট চোখ তার ভাটার মত লাল। বলল, 'কি করবি কি? বাঁশীও বাজাব, পাড়ায়ও থাকব, কার কি মুরোদ আছে, করবি আয়।'

বেচার তাড়ির ঝোঁক ছিলই। এবার স-কার ব-কারে চলে এল। বলল, 'বেজন্মা, তুই পাঁচি কেওরানির রক্ত গরম দেখাচ্ছিস?'

রাজা কোন কথা না বলে আগে বেচার গালে একটা থাপ্পড় কষালে, 'শালা, আমার জন্মো দেখাতে এয়েছ?'

যারা সামলাতে ব্যস্ত ছিল, তারা ভয়ে সরে গেল। কারণ, বেচার মূর্তি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। সেও পিছিয়ে গিয়ে ঢোলকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে গলা থেকে। চারিদিক থেকে আটকে পড়া শুয়োরটার মত বিশাল কালো শরীরটা নিয়ে সে এক পা এক পা করে এগুতে লাগল রাজার দিকে। এবার আর চেঁচিয়ে নয়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে ক্রুর চাপা গলায়, 'ও এত বাড় তোর? ছেউটিকে পাওয়ার নোলা তোর এতখানি বেড়েছে? ছেউটিকে চাস তুই? আমার গায়ে হাত তুললি তুই? বেচা কেওরার গায়ে হাত তুললি তুই?'

রাজা অনড়। শিকারীর মতই খ্যাপা শুয়োরটাকে দেখছে সে।

যারা সরে গিয়েছে, তারা তখনো চিৎকার করতে লাগল, 'বেচা, চলে আয়। একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।'

মেয়েদের মধ্যে কে একজন রাজাকে উপলক্ষ করে বলে উঠল,

'তুমি চলে যাও না।'

মেয়েদের মধ্যে ছেউটিও দাঁড়িয়েছিল। ভয় তার করছিল ঠিকই, তবু তার বড় বড় কটাসে চোখ দুটির অতলে একটি চাপা তীব্র কৌতূহল ঝিকিমিকি করছিল।

পণ-শুল্কা কেওরানি মনে মনে বীর্যশুল্কা হয়ে উঠল। শ্বাপদ সমাজের সেই আদিরূপিণী নারী। কিন্তু মানুষ, তাই যার বাঁশী শুনে সে উতলা হয়ে, ভর সন্ধ্যেয় চুল এলিয়ে অন্ধকার ঘাটে যায়, তারই দিকে তার নজর রইল আটকে।

বেচা হঠাৎ ডাকাতের কুক দেবার মত, চিৎকার করে উঠল, 'তোর রক্ত দশ্‌শন করব আজ, তবে আমি জন্নু কেওরার ব্যাটা বেচা কেওরা।' বলেই সে হাত চালাল রাজার ওপর। রাজা সরে গেল, বেচার হাত আঘাত করল শূন্যে। বলল, 'পালাবি রে বেজন্মা, পালাতে চাস তুই?'

রাজা এবার চিৎকার ক'রে বলল, 'সরে যা বেচা, মিছিমিছি হাঙামা করিস্‌নে।'

কিন্তু বেচার এক কথা, রাজার রক্ত দর্শন করবে সে।

কে যেন চিৎকার করে বলল, 'থাম্ থাম্ তোরা। পুলিস-টুলিস আসবে, পাড়া শুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে।'

বেচা বলল, 'আসুক। শালাকে 'ফাইট' দিতে হবেই।'

মারামারি নয়, ফাইট। যুদ্ধের সময় থেকে এসব কথা আমদানি হয়েছে কে'ওরাপাড়ায়। বেচারা এখন মারামারিকে ফাইট দেওয়াই বলে।

বেচা আবার গোঁ গোঁ করে রাজার ওপরে গিয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল রাজা। যোয়ানদের মধ্যে কে একজন শিস্ দিল। কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'লড়কে লাও। মিস্ নাদিয়া!'

কিন্তু রাজা ক্ষিপ্র, শরীরে তার মাংসের বোঝা নেই। লাফ দিয়ে উঠেই সে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি কষালে বেচার মুখের ওপর।

সবাই একবাক্যে চিৎকার করে উঠল, 'গেল গেল !'

রাজা আবার ঘুষি কষালে বেচার মুখেই।

বেচা রাতকানার মত ঘুরতে লাগল পাক দিয়ে। তারপর চিৎকার করে উঠল, 'মেরে ফেললে গো, আমাকে মেরে ফেললে।'

যেন হঠাৎ সব আগুন নিভে ছাই হয়ে গেল। বেচার নাকে মুখে রক্ত।

রাজার কানের পিছেও রক্ত লেগেছে। মাটিতে বোধহয় কিছু ছিল। আছাড় খেয়ে, কেটে গিয়েছে সেখানে।

বেচা চিৎকার করতে লাগল, 'পুলিস ডাক, পুলিস।'

রাজা বলল, 'তাই নিয়ে আয়। পঞ্চেত সুদ্ধ্ আজ পুলিসে যাব।'

পঞ্চায়েতের মোড়লরা তখন ফরসা। অল্পবয়সী যোয়ানেরা বলতে গেলে রাজারই পক্ষে চলে গিয়েছে।

জনু কেওড়ার বিধবা বেচার মা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

শুধু ছেউটি ঠোঁট উল্টে বলল, 'মরণ! মিনসেদের মুখে আগুন।' কাকে যে বলল, বোঝা গেল না।

পুলিস অবশ্য ডাকা হল না। পুলিস ডাকা মানেই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়া। পাড়াকে পাড়া সুদ্ধ ধরে নিয়ে যাবে, তারপর কান্নাকাটি শুনে মাথা পিছু এক টাকা নিয়ে ছেড়ে দেবে হয় তো।

সবাই এসে ঘরে তুলে নিয়ে গেল বেচাকে। রাজা চলে গেল মাঠে।

আমি দেখছিলাম, পৃথিবীর এই আদিমতম সংগ্রাম যখন ঘটছিল, রাণীর বাজারের শুদ্ধ বর্ণদের ভাষায়, ভাগাড় পাড়ায়, তখন সেই আদিম পরিবেশের মধ্যেও যেমন টিমটিমে বিজলী বাতি জ্বলছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী জোরালো আলো জ্বলছিল রাণীর বাজারের সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত জায়গায়। রাণীর বাজারের আর এক প্রান্তে তখন অনেক আধুনিক যানবাহনের ভিড়। হয়তো তার আকাশের ওপরে উড়োজাহাজও ছিল। রাণীর বাজারে কলেজ আছে, স্কুল

আছে, কারখানায় টন ওজনের টারবাইন মেশিনটা হয়ত সভ্যতার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে মিনিটে পাক খাচ্ছিল সহস্রবার। হয়তো তখন কমার্শিয়াল স্কুলে ছেলেমেয়েরা খট্ খট্ শব্দে টাইপ শিখছে। হয়তো, আঁচল ছেড়ে কোন নাবালক ছেলে ঘরের জানালায় গালে হাত দিয়ে বসে বসে যন্ত্র-অভিযানের স্বপ্ন দেখছিল।

হয়তো তখন রাণীর বাজারের বাঙালী শিল্পপতির লেফট্ হ্যাণ্ড ড্রাইভ ফোর্ডটা কিংবা রাণীর বাজারের স্কচ-চটকলের ম্যানেজারের সেভ্রলেট লেটেস্ট মডেলের গাড়িটা রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে থেমে পড়ছে। রাণীর বাজারের সুবিখ্যাত 'নগরপিতা' বিশালস্কন্ধ ষণ্ডটি দাঁড়িয়েছে হয়তো রুখে। কারণ, মেজাজ তার ভাল নেই। ফোর্ড কিংবা সেভ্রলেটের শক্তি জানে না সে গোঁয়ারটা।

এখানে যেমন এই মুখোমুখি, তেমনি আলোকজ্জ্বল সুসভ্য রাণীর বাজারের টুকরো এলাকা দেখে, তার আর এক মুখে, অন্ত্যজদের ওই ভাগাড় পাড়াটাকে মনে মনে আঁকা যায় না সহসা।

এসব আলোরই গুণ। শুধু বিজলী আলোর নয়, আরো অনেক রকম আলোর।

রাণীর বাজার শহর হতে গিয়ে পারেনি, সেই আদ্যিকালের পুরনো নগরীটাই রয়ে গিয়েছে। রাণীর বাজার গ্রাম থাকতে পারেনি, শহরের নীচের ওই অন্ত্যজ পাড়াগুলিতে গ্রামের অবশেষ ঠেকে আছে। শিল্পনগরী হওয়ার সাধ ছিল রাণীর বাজারের উনিশ শতকের শেষ দিকে, কিন্তু কারখানার বিদেশী সাহেব কর্মচারীদের ইমারতের কাঁটাতারের চৌহদ্দি সরিয়ে সে বস্তি-নগরী হয়ে গিয়েছে।

রাণীর বাজারের আশা ছিল, সাধ মেটেনি। সে না পেরেছে ঘরমুখী হয়ে তার শান্ত নিঝুম আঙ্গিনার গৌরব করতে, না পেরেছে ঘাটের সীমানায় গিয়ে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে কোলাকুলি করতে। রজকের পা বাঁধা গর্দভটার বিড়ম্বনা তাই তার পদে পদে। 'ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে' আধা খ্যাঁচড়ার এই যন্ত্রণাটা তাই রাণীর বাজারের ললাটে যুগের লিখন।

তাই, কারখানার টেনিস্ লনের হাজার পাওয়ারের বিজলী আলো কেওরাপাড়ার মনসাতলার বটের মাথায় পড়ে, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, তার জন্মের অনেক, অনেক আগের পুরাণবর্ণিত সমাজ এখনো ক্ষয়ে যায়নি। এই রাণীর বাজারেই এখনো সেই প্রাচীনের বীর্যশুল্কা নারী। পুরুষেরা লড়ছে শ্বাপদ সমাজের মত। মানুষ ও শুয়োর সেখানে পড়ে আছে জড়াজাপাটি করে।

কিন্তু এই আদিমতার নিটুট রূপ এখন আর টিঁকে থাকে না। যে তন্ত্রধার রাণীর বাজারকে ধীরে ধীরে এই রূপে সৃষ্টি করেছে, তার মতিগতি ভিন্ন।

আমি দেখছিলাম, তলে তলে সে তার নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কেওরাপাড়ার অন্ধকারে সে তার থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি দেখছিলাম, আদিম সমাজের বীর্যশুল্কাকে সে তার কালের প্রভাবে পণ্য শুল্কা করেছে আবার।

তাই পণ্য শুল্কা ছেউটির বিয়ে হয়ে গেল বেচার সঙ্গেই।

সহজ কথা নয়, বেচা কেওরার বিয়ে। এগারটা শুয়োর আছে যার, বাচ্ছা বিক্রী করেও। তিনখানা দশহাত ধুতি, একটা চায়না 'সিলিকেরের' পাঞ্জাবি, বুট জুতো আছে যার। একশো পঁচিশ টাকা নগদ গুনে দিয়েছে যে মেয়ের বাপের হাতে, দশজনের সামনে। কাগজের টাকা থেকে আনি দুয়ানি ডবলপয়সা সব রকম ছিল তাতে। গণেশ কেওরাকে কোঁচড় পেতে নিতে হয়েছে।

শুধু তাই নয়, কথামত আধমণ বালাম চালের ভাত রান্না হল। বেচার এনে দেওয়া পান মুখে দিয়ে, পাড়ার কেওরানিরাই সে ভাত রান্না করল। মাংসটা রান্না করল অবশ্য পুরুষেরা। আগের দিন রাত্রেই একটি মাঝারি নধর শুয়োরকে মেরে, গরম জলে ওপর ওপর চামড়া নরম করে রাখা হয়েছিল। গঙ্গার ধারে বসে, ছুরি দিয়ে যখন চাঁছা হল, মনে হল দুধের মত সাদা। শুয়োরের লোমগুলি অবশ্য বেচার মা কাউকে দিল না। 'মিনিপালির' নর্দমা সাফ করা মেথরটাকে, কিংবা সাহেববাড়ির ঝাড়ুদারটারকে বিক্রী করবে। শুয়োরের লোম

দিয়ে ভাল নর্দমা সাফ-করা বুরুশ তৈরী হয়।

তা ছাড়া, বেচার ঢোলক তো ছিলই। তার ওপরেও এসেছে বেদো ডোম তার ঢাক নিয়ে, যেটা পৌরসভার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, ঢোল শহরতের সময়, এক টাকা রোজে বেদো বাজিয়ে থাকে রাণীর বাজারের সদর অন্দরের রাস্তায়। বাবুদের শিখিয়ে দেওয়া কথা সে নিজেই ঢাক পিটিয়ে বলে, 'আমাগি (আগামী?) কাল থেকে, শ'রের রাস্তাঘাটে যদি কারুর পোষা কুকুর গলায় বেল্ ছাড়া বেরয়, তবে সে মরতে পারে, তাতে কেউ দাবী হবে না। আপত্য হবে না।' ডুম্ ডুম্ ডুম্।

সেই বেদো ডোম এসেছে তার ঢোল নিয়ে। সঙ্গে ছেলে এসেছে কাঁসি নিয়ে। ঢোলক কাঁসির শব্দে কেওরাপাড়া রীতিমত জমজমাট। অবিশ্যি, পয়সা দিয়ে নয়। বেদোর আজ সপরিবারে আহারের বন্দোবস্ত হয়েছে।

বেচার পায়ে তো তাল লেগেই আছে। চলায় ফেরায় তার নাচেরই তাল। অনেকেরই পায়ে তাল লেগে গিয়েছে, কেননা, বেচার হাত দরাজ। সকাল থেকেই তাড়ির ভাঁড় খোলা হয়েছে।

কেওরাপাড়ার সকলেই নিমন্ত্রিত, রাজা ছাড়া। তার পাত্তা নেই।

এটা অবশ্য সকলের মনঃপুত হয়নি। শত হলেও একটা আনন্দের দিন।

ছেউটিকে দেখলে অবশ্য কিছু বোঝার উপায় নেই যে, রাজার জন্যে তার মন পুড়ছে বা বিরহে মুখ ভার করে আছে। গলায় তার রূপোর বিছে হার। হাতে রূপোর চুড়ি, কানে রোল্‌গোল্ডের (ওতো বাপু সোনাই!) দুল পরেছে। গন্ধ 'সাবাং' দিয়ে চান করেছে। কটা কটা মুখখানিতে আজ মেখেছে হিমানি সিনো। তাতে তার পান পাতার মত মুখখানির লাবণ্যে শাস্ত্র সুলক্ষণের চন্দ্রাভা লেগেছে। দেহেও যেন সূর্যচ্ছটা। ঝালর দেওয়া সায়া ও কুঁচি দেওয়া হাতা লাল 'বেলাউজের' ওপরে মিলের সবুজ শাড়ি পরেছে। গন্ধ তেল মেখে, চুল আঁচড়ে, খোপা বেঁধেছে আঁট করে। খোপায় বিষ্টুপুরী কাঠের কালো

চিরুনি গুঁজেছে। আরো গুঁজেছে কুঁচফলের মত লাল বড় পুঁতির কাঁটা। খোঁপাটা তো একটুখানি নয়। তাকে সামলে রাখতে হয় নানান গোঁজা দিয়ে।

কাজল টানা কটাসে চোখ ছেউটির একটু লাল্‌চে। লাল্‌চে পেঁয়াজের খোসার মত চকচকে। শোনে না, মেয়ে বউয়েরা ধরে গিলিয়ে দিয়েছে। ছেউটি হেসে কুল পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে তার। বান্ধবীরা সঙ্গ ছাড়ছে না দু'তিনজন। বিশেষ করে পানার বউ মুকি। কানে কানে এক একটা কথা বলছে, আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে ছেউটি। আঁচল খসে খসে পড়ছে, নিজের জামা নিজেই টানছে থেকে থেকে। মুকি ধমকে উঠছে, 'এই ছুঁড়ি, নেশা হয়েছে তোর।' শুনে ছেউটি আরো হাসে খিলখিলিয়ে। মুকি মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে ছেউটিকে। ছেউটি হাসতে হাসতেই খেপে গিয়ে দমাদম কিল মারছে মুকির পিঠে।

পণ্যশুল্কা ছেউটি আজ কেওরাপাড়ার রাণী।

রাণী অনেকদিন থেকেই। ভক্তবৃন্দের নানান উপহারের উপচার তাকে নিবেদন করা হয়েছে। ছেউটি তা গ্রহণ করেনি। তার চেয়ে বেচা কেওরার আয়োজন অনেক বেশী ছিল।

রাজার কথা ভাববার অবকাশ কোথায় ছেউটির? সতর বছরের ছেউটি। কেওরাপাড়ায় আজ তাকে কেন্দ্র করে যে উৎসবের আয়োজন, তার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে সে। সে খুশি, খুবই খুশি। মাতালের মত নয়, মাতাল-ই হয়ে গিয়েছে সে।

রাত্রে হ্যাজাক জ্বলল। বেচা জামা কাপড় পরে সাজলে। কেওরাদের বামুন এল। মন্ত্র পড়া হল, হয়ে গেল বিয়ে।

গঙ্গার ধারে হরিধ্বনি শোনা গেল। চিতা জ্বলল যেন তার। বিবাহ ও মৃত্যুর হিসেব কষতে লাগল যেন কোন মাতাল বুড়ি।

বেদো যতক্ষণ পারলে ঢোল বাজালে। ছেলেটা যতক্ষণ পারলে বাপের সঙ্গে কাঁই নাই করলে। তারপর এক সময়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে মুখ দিয়ে।

রাজা বাঁশী বাজালে না। কিন্তু সেই আঁশসেওড়া আকীর্ণ উঁচু টিবিতে বসে, নন্দ হাড়ীর মত সেও তাকিয়ে রইল দূর গঙ্গার বুকে। পশ্চিমা ব্যাপারীদের খুটনী নৌকার আকাশ-ঢাকা পালগুলির বাতাস লাগছে তার গায়ে। যে দেশে ছেউটি নেই সেই দেশের মাটি তাকে ডাকছে।

কিন্তু রাজা কোথাও যেতে পারলে না। ছেউটির হাসি তাকে বেঁধে রাখলে। ছেউটি তার ঘরের কোণে এসে হেসে যায়। চোখে চোখ দিয়ে, অদৃশ্য বন্ধনে রেখে যায় বেঁধে।

ছেউটি এখন ছেউটি নয়, বেচার কেওরানি। তবু হাতছানিটা রয়ে গেল অন্ধকারে। রাজা কেওরা কোথাও যেতে পারলে না।

পারলে না, তার কারণ, ছেউটিকে উত্তরে দেখে রাজা দক্ষিণে মুখ ফেরালে, ছেউটি দক্ষিণে পাক খেয়ে যায়। তবু রাজার চোখের উপর দিয়ে যায়। রাজার বুকে চির আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে চায় ছেউটি যেন। যে দিন ছেউটি থাকবে না, গঙ্গায় চিতা সাজিয়ে ওকে পোড়ানো হবে, সেইদিনেও রাজার বুকে ছেউটির আগুন জ্বলতে থাকবে গন্‌গন্‌ করে।

দু'দিন রাজা বাঁশী বাজায়নি। ছেউটির বিয়ের দিন, আর তার পরের দিন। কিন্তু ছেউটির জন্য বাঁশী নয়, বাঁশী তার অনেক আগের।

বাঁশীর জন্যে ছেউটি এসেছিল, তাই বাঁশী যখন বাজে তখন ছেউটিও থাকে সুরের মধ্যে। কিন্তু বাঁশী ঠিকই বাজায় রাজা। বেচা কেওরার প্রাণ তাতে যতই জ্বলুক। যদিও অনেকখানি এখন নিশ্চিন্ত বেচা, কিন্তু সেই আক্রান্ত শুয়োরের নজরটা তার চোখ থেকে গেল না আর।

বছর কাটাবার আগেই, ছেউটি হারিয়ে গেল কেওরাপাড়া থেকে।

কোথায় গেল ?

কেউ জানে না।

বেচা কেওরা শুয়োর মারা লাঠিটা নিয়ে গিয়ে, চড়াও হল ছেউটির বাবা গণেশ কেওরার ভিটেয়। হয় মেয়ে বার কর, নয় পণের টাকা দাও ফিরিয়ে।

গণেশ কেওরাও লাঠি ধরলে। আর সকলের সামনে কাছা ঝাড়া দিয়ে দেখিয়ে বললে, মেয়ে তার কাছায় বাঁধা নেই।

রাজার কাছে কেউ ছেউটিকে খুঁজতে এল না। কারণ রাজাও সকলের সঙ্গে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কোথায় গেল ছেউটি ?

ঘটনা নতুন নয়, কেওরাপাড়া থেকে যুবতী মেয়ে এর আগেও অনেকবার হারিয়ে গিয়েছে। কখনো খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, কখনো পাওয়া যায়নি।

শুধু কেওরাপাড়া থেকে কেন ? খাস দ্বিজপাড়া থেকেই এক ঠাকুরের মেয়ে একবার নির্যাস গুম্ হয়ে গিয়েছিল না ? কালে কালে তো তারপরে কত মেয়েই হারিয়ে গেল, আর তারা যুবতীও বটে। প্রথম যে মেয়েটি হারিয়ে গিয়েছিল, পনর বছর বাদে সে একবার ফিরে এসেছিল দ্বিজপাড়ায়। এখনো বুড়োবুড়িরা বোধহয় সে কথা ভুলে যায়নি। একদিন তারা দেখল দ্বিজপাড়ার রাস্তায় এক কাবুলী আর তার বোরখাহীনা বিবি। যদিও বিবির বয়স ত্রিশের উর্ধ্বে, তবু যৌবন যেন তার অটুট। ফর্সা লাল রং, কালো কুচকুচে চোখে তার সুরমা টানা। পোশাক তার কাবুলী গিন্নিরই, গায়ে হিংএর গন্ধ। সঙ্গে তার চোদ্দ বছরের লম্বায় চওড়ায় দশাশয়ী কাবুলি ছেলে।

বিবি চারিদিকে তাকাতে লাগল। কি যেন খুঁজছে সে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের ঘিরলে। এক বুড়ি এসে দাঁড়াল যখন চোখ কুঁচকে কৌতুহলবশে, তখন বিবি তার রাঙা ঠোঁটে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'গাঙ্গুলী বাড়ির বটঠাকমা না তুমি ?'

গাঙ্গুলিবাড়ির বটঠাকমা, চোখ তুলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে বাছা তুমি ?'

বিবি বলল, 'আমাকে চিনতে পারলে না ? আমি পদ্ম গো।'

কথার উচ্চারণে একটু রকমফের হলেও, বাংলাদেশের সুর বেজে উঠল বিবির গলায়। বটঠাকমার চোখ খাবলার মত অপলক হয়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলে, 'কোন্ পদ্ম ?'

বিবি বললে, 'তোমাদেরই পাড়ার, মান্নু চাটুজ্জের মেয়ে—'

আর বলতে হয়নি। বট্‌ঠাকমা একটা চিৎকার দিয়ে সেখানেই বসে পড়েছিল, 'ও মা মানুর মেয়ে পদ্ম তুই ?'

দেখতে দেখতে পাড়ার লোক জমল। যেন চিড়িয়াখানার জীব দেখতে ছুটে এল সব।

কিন্তু পদ্ম যে জন্য এসেছিল, তার কিছুই নেই। বাপের ভিটে নেই, দ্বিজপাড়ায় একটা চমক দিয়ে, সোরগোল তুলে পদ্ম তার কাবুলি বর ও ছেলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল আবার।

রাণীর বাজারের কালের কপোলে পদ্মর চিহ্ন কবেই মুছে গিয়েছে। মানু চাটুজ্জের ঘর থেকে মেয়েটা খেতে না পেয়ে পালিয়েছিল কিংবা কাবুলির প্রেমে পড়ে পালিয়েছিল, সেটা এখন গবেষণার বিষয়। কখনো কখনো হয়তো কোন বাড়িতে হঠাৎ পাড়ার পুরনো বিষয় আলোচনা হয়। তখন শোনা যায়, 'ওমা গো, আমি স্বচক্ষে দেখেছিলুম পদ্মকে, অ্যাই বিরাট চেহারা, এই একেবারে এতখানি হাত পায়ের গোছা, টকটকে রং যেন ফেটে পড়ছে। পদ্ম তো নয়, যেন সত্যিকারের কাব্‌লেনী গো। আহা! কী রূপ! আর ছেলে কী! কার্তিকের মত সুন্দর, এই লম্বা চওড়া চেহারা। চোদ্দ বছরের ছেলে তো নয়, যেন মস্ত বড় মিন্‌সে।'

মানুষের মন। সে যে বড় বিচিত্র। পদ্মর কথা বলতে গেলে, তাই এখন রংও চড়ে যায়। পদ্মর রূপ, পদ্মর স্বামী পুত্রের কথায়, দ্বিজ-পাড়ার আলোচনায় যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ে হঠাৎ।

সুদূর কাবুলে হারিয়ে যাবার কাহিনীও আছে এই রাণীর বাজারে। আর দ্বিজপাড়া থেকেই।

কেওরাপাড়ায় হারায় তার চেয়ে অনেক বেশি। ছেউটি তেমনিই হারিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়।

কয়েকদিন পর, সন্ধ্যার ঝোঁকে, রাজা তখনো ঘরে। বেরুতে মন চায়, শরীরটা ওঠে না। ছেউটিকে খুঁজতে বেরোবার তার বড় ইচ্ছে। কিন্তু কোথায় গেছে ছেউটি, নিজের ইচ্ছায় গেছে কিনা সে কথা জানে না রাজা।

এবার ঘাটের দিকে পা বাড়াবার সময় এসেছে। দিন এসেছে দূরে ভেসে যাবার। কোথাও গিয়ে যদি দেখা হয়ে যায় নন্দ হাড়ীর সঙ্গে, তবে বড় ভাল হয়। তবু কথা বলার মনের মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে একটা।

সেই সন্ধ্যার সময়, কার চিতা যেন জ্বলছিল। গঙ্গার ধারের রাস্তায় বিজলী আলোর চেয়ে চিতার আলো অনেক বেশি দেখাচ্ছিল। মানুষেরা ছায়ার মত ঘুরছিল সেখানে। কুকুরেরা চিরবশংবদের মত মাথা এলিয়ে পড়ে ছিল আগুনের দিকে চেয়ে।

রাজার ঘরের সামনে একটা মানুষের ছায়া পড়ল।

ঘরের ভিতর থেকেই রাজা জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

জবাব শোনা গেল, 'আমি। একটা কথা ছেল।'

রাজা গলার স্বর শুনে অবাক হয়ে উঠে এল কাছে। বেচা কেওরা দাঁড়িয়ে আছে। গলায় তার ঢোলক।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর এই দু'জনের প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ।

রাজা বলল, 'কি চাই?'

বেচা নেশা করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চোখ দুটি লাল। আক্রান্ত শুয়োরের মত নয়, কেওরাপাড়ার গঙ্গার ধারে পাঁকে শুয়ে থাকা, চিরবাদী শুয়োরের দৃষ্টি তার চোখে। সবভূক কুকুরের মত অলস আর নিঝুম ভাব তার।

বলল, 'তোর কাছে এলুম রাজা।'

'কেন?'

রাজার দিকে চোখ তুলল বেচা। যেন, ভিক্ষে চাইতে এসেছে। বলল, 'তোর পিটুলীতলায় বসে, এটটুস ঢোলক বাজাব।'

'ঢোলক বাজাবি?'

'হুঁ। ঢোলক বাজাব রাজা তোর কাছে বসে তুই বাঁশী বাজাবি?'

বড় করুণ গলায় বললে বেচা। পায়ে না পড়েও, যেন পায়ে ধরে সাধার মত। রাজা যদি ঘৃণা করে। বলল, 'তুই এটটুস বাঁশী বাজা রাজা, আমি ঢোলক বাজাব তোর সঙ্গে। বাজাবি?'

রাজা চুপচাপ। কিন্তু তার চোখ আর বেচার উপরে নেই, হারিয়ে গেছে যেন কোন্ সুদূরে। বুকে তার মোচড় লাগছে বড়।

জবাব না পেয়ে বেচা আবার বলল, 'একা একা বাজাব। তাই ভাবলুম কার কাছে যাই। তা, মন বলল, রাজার কাছে যাই। পাড়ায় আর মানুষ খুঁজে পেলুম না রাজা। তোর সঙ্গে এট্টু বাজাতে দিবি?'

রাজা বলল, 'দেব। আয়, বস্।'

রাজা বাঁশী বাজালে। সেই গানটা বাজালে, যে গান শুনতে প্রথম দিন ঘাটে গিয়েছিল ছেউটি। তার সঙ্গে তাল দিয়ে, ঢোলক বাজালে বেচা। এ সুর তারো চেনা। ছেউটিকে গুন্‌গুন্ করতে শুনেছে সে।

কেওরাপাড়ার লোকেরা শুনল রাজা আর বেচা, বাঁশী আর ঢোলক বাজাচ্ছে।

বাজানো শেষ হয়ে গেল।

বেচা বলল, 'ছেউটি চলে গেছে রাজা।'

রাজা বলল, 'জানি।'

'কোথায় গেছে, জানিস্?'

'না।'

বেচা বলল, 'মলপোতা পাড়ায়।'

রাজা চমকে উঠে বললে, 'কে বললে?'

'আমি দেখে এয়েছি।'

'দেখে এয়েছিস্?'

'হুঁ, কথা বলে এয়েছি। অঘোর ঘোষ, কায়েত পাড়ার অঘোর ঘোষমশাই, সোনার মতন পালঙ্ক দিয়েছে ছেউটিকে। তাতে মস্ত উঁচু গদী, ধব্‌ধবে বিছানা। আয়না বসানো আলমারী আছে একখান ঘরের মধ্যে, পা থেকে মাথা অবধি দেখা যায় তাতে। বলেছেন নাকি, সোনার গয়না দেবেন, গড়তে গেছে স্যাকরা বাড়িতে। বাহারি শাড়ি দিয়েছেন, ছেউটি দেখালে। পায়ের জুতো দিয়েছেন ছেউটিকে, আল্‌তা সিনো পাওডারের তো কথাই নেই। হাত ভরতি টাকা দিয়েছেন, তাও দেখালে আমাকে ছেউটি। বললে, মাসে মাসে এই এত এত গুলেন করে টাকা দেবেন!'

আর বুঝি শুনছিল না রাজা। নিশি পাওয়া স্থবিরের মত বসে ছিল সে।

বেচা বলল, 'অঘোর ঘোষ মশাইয়ের পণ অনেক চড়া।' দশবার জন্মালেও বেচা কেওরা অত পণ দিতে পারবে না। 'তা ছেউটি আমাকে বললে,'বাবুকে বলেছি, তোমার পণের টাকাটা বাবু দিয়ে দেবে বলেছে।'

পণ-শুল্কা কেওরানি! নীলামের ডাকের মত যত দাম চড়ে, তত দামে বিকোয়।

তবে সেটা কেওড়ার পণ নয়, রাণীর বাজারের প্রবৃত্তির পণ। বেচা আবার বললে, 'তা, মিছে বলব না, ক'দিনেই ছেউটির বড় বাহার খুলেছে। দেখতে ভাল হয়েছে আরো। কেওরাপাড়ায় অনেকদিন বাদে ছেউটির মত এটটা মেয়ে দেখা গেছল, থাকল না। সে কথা বললে ছেউটি। আমি যখন জিগেসা করলুম, তা এমন করে চলে এলে ছেউটি? বললে, কি করব বল। দশদিন শুনতে শুনতে একদিন রা কাড়তে হয়। কতদিন থেকে কত জনে ফুসলোচ্ছে। অমুক বাবু নাকি ছেউটি কেওরানির জন্য মরছে, তমুক বাবু পাগল হচ্ছে, তোমার গোটা রাণীর বাজার কপাল চাপড়াচ্ছে ছেউটির জন্যে। সোনাদানায় ঘর ভরিয়ে দিতে চায়, রাণীর মতন সুখে রাখতে চায়, বাস্কো ভরে টাকা দিতে চায়। তা'পরে শুনলুম, কোন্ দিন তোমার গলা কেটে রেখেই নাকি নে যাবে আমাকে। তা আমি কি করব? ভাতারের ঘর করা আমার হবে না।' বেচা থামতে চায় না। বলেই চলল, 'ওখেনে রাগারাগি করা চলে না। মেরে আমাকে ঠাণ্ডা করে দেবে। রাগ আমার হয়নিকো। তবে, মিছে বলব না, ছেউটির দিকে চেয়ে আমার ধন্ধ লাগল, এই মেয়ে আমার বউ ছিল।'

রাজা বলল, 'বেচা, ও সব কথা আর থাক।'

বেচা বলল, 'আর এটটু বলি। তোকে বলতে হবে রাজা। ছেউটিকে বললুম, পাড়ার জন্যে তোর মন কাঁদে না ছেউটি? ছেউটি বললে, মন কাঁদলে আর কি করব বল এখন যেতে পারব না। তবে রাগ কর আর যাই কর, বাঁশী শুনতে আমার মন করে।'

রাজা প্রায় চুপি চুপি বলল, 'বেচা, চুপ করে থাক।'

'না রাজা, তোকে বলব। ছেউটি বললে, তা যাই বল, যদ্দিন বেঁচে থাকব, বাঁশী শুনতে আমার মন করবে। কেওরাপাড়ার মনের মতন এটটা মানুষ ছেল। তা আমি কি করব? তোমরা দশজনে মিলে তাকে মিছিমিছি তাড়ালে, আমিও বাবুর ধানে সুখের পায়রা হলুম। আমার অনেক ভাগ্যি, তার ঘর করতে গিয়ে আমাকে বাবুর মেয়েমানুষ হতে হয়নি। তাকে আমি দুঃখু দিয়েছি, সে আমার পরে রাগ করবে। করুক। তা আমি কি জানি?'

রাজার মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা। রাজা যখন বলছিল, সে বেচার চেয়ে বেশী কিংবা কম পণ কিছুই দিতে পারবে না। পণ ছাড়া যদি হবে না, তাই রাজা বলেছিল ছেউটিকে, 'তবে আঘাটায় কোন র‍্যালা করতে এলি ছেউটি?'

শুনে ছেউটি বলেছিল, 'তা আমি কি জানি?'

ছেউটি কি জানে?

সতর বছরের ছেউটির সেই মুখখানি মনে পড়ল রাজার।

বাপ পণ পাক, নিজের সুখ হোক, তবু রাজার বাঁশী শুনতে প্রাণ চাইবে আঁশসেওড়া ঢিবিতে আসতে ইচ্ছে করবে।

ছেউটি কি জানে?

ছেউটি ধনতান্ত্রিক যুগের সেই চির নায়িকা, যার প্রাণ যেখানেই পড়ে থাকুক, মন কাঁদুক যার জন্যেই, পণের ডাক যত চড়বে, যেখানে চড়বে, তাকে সেখানেই যেতে হবে। কেওরাপাড়ার রূপসী যুবতী তাই রাণীর বাজারের জেগে থাকা চির রাত্রির গ্রাস কবলিত হয়েছে।

ছেউটি হল সেই তাদের দলের মানুষ, জীবন যাদের ভেসে চলার নোঙরহীন দুর্বার বেগ দিয়েছে, কিন্তু জন্ম ও সমাজ যাদের হাল দেয়নি। সেই চির দুর্ভাগ্যবতী ছেউটি। ঠেকবে, ভাঙবে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে।

রাজা ভাবে কাকে ঘৃণা করবে? কার ওপরে রাগ করবে? চোখের সামনে, গঙ্গার ধারের কোল আঁধারে তার বুকেপড়া মেয়েটার সেই

অসহায় উক্তিটাই মনে পড়ছে বারে বারে, আমি কি জানি? সত্যি ছেউটি কি জানে! সংসারে কত মেয়েই জানে না। শুধু ছেউটি কেন? সংসারের রীতি তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলছে। সেই খেলার ঘূর্ণিতে পড়ে অসহায় মেয়েটা অসহায়ভাবেই বলছে, 'আমি কি জানি?'

একদিন হয়তো জানবে, জেনেও তবু সেদিন আর পাঁচি কেওরানির মত চিরদিনের নারীত্ব তার সাময়িকভাবে বিদ্রোহ করতে পারবে না। যে নিগড়ে সে পড়েছে একদিন সেই নিগড়ের জালে সে মরবে। আরো অনেককে মৃত্যুর বিষ দিয়ে যাবে।

তাই ছেউটি স্বৈরিণী নয়, স্বেচ্ছাচারিণী হওয়ার ক্ষমতা তার নেই। সে রাণীর বাজারের সৃষ্টি, রাণীর বাজারেরই ক্ষুধার গ্রাস হয়ে রইল।

তাই রাজার শুধু মনে পড়ে তার ঈশ্বরেরই কথা, এতদিন ধরে যারা আমাদের সবাইকে মেরেছে, এখনো মারছে, এবার তাদেরই মরণটাকে ঘনিয়ে আনতে হবে।

কেমন করে? ন'কড়ি ঠাকুর অনেক লেখাপড়া জানে, সভা করে, বক্তৃতা দেয়, পুলিস তাকে ভয় করে। 'ওদের' মরণ ঘনিয়ে আনার জন্য ন'কড়ি ঠাকুরের যুদ্ধের রীতিনীতি রাজা জানে না, বোঝে না। দলের সকলের সঙ্গে সে জানবার চেষ্টা করে। 'ওদের' মরণ ঘনাবার যুদ্ধে সে সামিল থাকবে চিরদিন।

থাকবে, তবু আজ ছেউটিকে ফিরে পাওয়া যায় না।

বেচা কখন একসময়ে উঠে গেছে। হয়তো পাড়ার কোথাও কিংবা ঘরে পড়ে আছে নেশা করে।

রাজা বাইরে এসে দাঁড়াল। গঙ্গার ধারের চিতার আগুন তার গায়ে আলো ফেলল।

আমি দেখেছিলাম, রাণীর বাজারের প্রবৃত্তির রংমহলের রন্ধ্রগুলি থেকে, লকলকে জিহ্বা ও অপলক চোখ কেওরাপাড়ার দিকে তাকিয়ে আছে। সেদিন আমি রাণীর বাজারের অস্পষ্ট আকাশের গায়ে

তেরছা মেঘের অশুভ হাসিটা ভুল দেখিনি, যে দিন রাজা কেওরার কাছে গিয়েছিল ছেউটি কেওরানি।

আমি ন্যায়তীর্থের চোখ নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করে দেখেছিলাম। ছেউটিকে। দেখেছিলাম, তার শাস্ত্রসম্মত সব সুলক্ষণগুলি।

এখন ইঁট-চুন-সুরকির গোলাওয়ালা প্রাইভেট কণ্ট্রাক্টর অঘোর ঘোষও দেখছে। প্রতিটি লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে ছেউটির আর অবাক হয়ে ভাবছে কায়স্থ-কুলতিলক ঘোষমশাই, এতগুলি সুলক্ষণ একত্রে তার ঘরেও কোন মেয়ের বুঝি নেই।

দেখছে, কেওরানি বিশালাক্ষি, বিম্বোষ্ঠ, সুকেশিনী, অ-রোমাবৃত পীনবক্ষ ও নাভিদেশ-উরু-জংঘা। স্নেহযুক্ত পদযুগল ছেউটির ভূ-কম্পিত করে না, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মাটিতে সম্পূর্ণ চেপেই বসে।

তবু ছেউটি রাণীর বাজারের অন্যতম গণিকাগলি মলপোঁতা পাড়ার এক পুরনো ভাড়াটে ঘরে, অঘোর ঘোষের পণ্যাঙ্গনা হয়েছে।

তবু শাস্ত্র শাস্ত্রই থেকে যাবে। তার সুলক্ষণ আর কুলক্ষণের যত বাখ্যা থেকে যাবে পাতার পর পাতা জুড়ে। শুধু অভিজ্ঞতার দায় বহন করতে হবে এ যুগের নরনারীকে, তাদের নিজের জীবনের মূল্যে।

রাণীর বাজারের প্রবৃত্তি গ্রাস করল ছেউটিকে। ছেউটিকে নিয়ে প্রবৃত্তির খেলা, রাণীর বাজারে শুরু হল শুধু।

অনেক বিশ্বরহস্য দেখলে রাজা।

রাণীর বাজারও এবার ওকে বিদায় দেবার আয়োজন করলে। শহরের জনসংখ্যার বাড়াবাড়ি, গঙ্গার এপার ওপারের লোকচলাচল বেড়েছে ক্রমেই। তাই, রাণীর বাজারের খেয়াঘাটের নৌকোর বদলে, এক রিভার সার্ভিস কোম্পানী এল তার লঞ্চ নিয়ে। এল, মান্ধাতা আমলে সেই নৌকো নিয়ে পারাপারের, দুর্যোগে ও বর্ষাকালের জীবনসংশয়ের অবসান করে। হাতের হাল অনেকদিন জল কেটেছে, এবার কলের হাল জল কাটতে এল রাণীর বাজারে।

সব নয় যদিও, অনেক মাঝি বেকার হল। কেননা, কলও বিগড়োয়

কখনো কখনো। দশজনের সঙ্গে নয়, শুধু ছুটিতে একলা নৌকোয় পারাপারের বাসনা নিয়ে যারা আসে, তাদের জন্যে, আর যে রাত-চরারা ঘড়ি ধরে চলে না, কলের হালের সঙ্গে পা মেলাতে পারে না, সন্ধ্যে হয় যাদের রাত বারোটায়, রাণীর বাজারে যাদের শুধু ওপার থেকে নৈশ অভিযানেরই উদ্দেশ্যে যাওয়া-আসা, তাদের জন্য রিজার্ভ রইল নৌকো। সেই রিজার্ভের নৌকোর জন্যে রয়ে গেল কয়েকজন মাঝি।

রাণীর বাজারের বৈতরণীর তরী বাওয়া শেষ হল রাজার। কেওরার ঘরের ছেলে, মাঝি হতে সে জন্মায়নি। হাতের কাছে ওটা একটি অবলম্বন ছিল।

রাজা এবার পালাতে চাইল রাণীর বাজার থেকে। জীবন তাকে সব দিক দিয়ে চলে যাবার পথ খুলে দিয়েছে।

কিন্তু জীবনের সব দেওয়াকে, হাত ভরে নেবার মত ক্ষমতা ক'জনের আছে। যে মাটিতে ওর জন্ম, সে মাটির ঋণ শোধ হয়নি। রাণীর বাজারের কাছে রাজার অনেক ঋণ। জীবনের অনেক রহস্যকে সে জেনেছে এখানে, তার শোধ দিতে হবে।

তারপর জীবন যদি বা ছাড়ে, মন ছাড়ে না। মনটাকে যে বেঁধে রাখলে, সে সর্বনাশের মত এক মহামায়া। যার কাছে সে মনে মনে অনেক ঋণ করে বসে আছে। না বলে যার তহবিল থেকে সে আপন মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে চেয়েছে তার দেনা শোধ না করে সে যাবে কেমন করে।

তাই, তরী বাওয়া ছেড়ে রাজা বাঁশীওয়ালা হল। ন'কড়িও সেই কথাই বলেছে। জীবিকার জন্যে রাজা বাঁশীওয়ালা হোক। সংসারে তো মানুষ কত কি করে। একটা পেট রাজা চালাতে পারবে যেমন-তেমন করে।

নিজের হাতে বাঁশী তৈরী করে, ঝুলি নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল রাজা। পুরনো একটি খাকি ফুল প্যান্ট, তার ওপরে একটি সার্ট, আর কাঁধে বাঁশীর ঝুলি।

তা ছাড়া ন'কড়ির কঠিন নির্দেশ আছে, বর্ণপরিচয় শেষ করলেই হবে না, রাজাকে প্রথম ভাগ শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি। কোটি কোটি ভাগ আছে। রাজাকে উঠতে হবে ধাপে ধাপে।

ওইটি রাজার নিত্যকর্ম-পদ্ধতি। রাত্রে সে ভাত খায়। নিজের হাতে উনুন ধরিয়ে, ভাত বসিয়ে সে বই নিয়ে বসে। পড়ে, অজ, আম, অজর, অমর।

কেওরাপাড়ার পিটুলীতলার ভিটেয়, চুপিচুপি বুঝি সরস্বতী ঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি হাসবেন না কাঁদবেন, ভেবে পান না। এ যুগটা কী সর্বনেশে! তাঁর সুউচ্চ টাট থেকে, কোথায় নামিয়েছে তাঁকে। এ যুগ তাঁকে কোথাও নিয়ে যেতে ছাড়বে না, কোন মানুষ বাদ থাকবে না তাঁর সাধনায়।

বেচা আসে মাঝে মাঝে। ছেউটির খবর বলতেই আসে। রাজা শুনতে না চেয়েও শোনে। শোনে, রাণীর বাজারের তলে তলে, প্রবৃত্তির অনেক খেলা শুরু হয়েছে। ছেউটিকে তারা একলা ভোগ করতে দেবে না অঘোর ঘোষকে। ঘোষের বাসর ছেড়ে ছেউটিকে নিয়ে টানাটানি চলছে বারোবাসরে।

ঘোষ পুলিস ডেকেছিল। কিন্তু রাণীর বাজারের পুলিস সাত বোঝে না, পাঁচ বোঝে না। যে যত বেশি হাত ভরে দিতে পারে, তারই পানসি ভাসে। ঘোষের পক্ষে এখনো পুলিসেরা।

বারোবাসরের বাড়িউলিরা অনবরত চর পাঠাচ্ছে ছেউটির কাছে। গোটা রাণীর বাজারের রংমহল যার পায়ে পড়তে চায়, ঘোষের পায়ে পড়ে আছে কেন সে?

বাড়িউলিদের মধ্যেও রেষারেষি। যে ছেউটিকে আনতে পারবে, তারই বারোবাসর আর একবার নতুন জমে উঠবে। দেহ-পণ্যের বাজারে এই হিসেবটাই চলে।

বিচিত্র এই, রাণীর বাজারের চির-জাগ্রত রাত্রির আসরে রাণীর ঐতিহ্য মরে না কখনো। একজন করে রাণী নামধারিণী কোথাও না কোথাও থাকে। না থাকলেও, নবাগতা কোন বিশেষ মেয়েকে রাণী

বলেই চালিয়ে নেয় তারা। ছেঁউটির সম্পর্কেও শোনা গেল, রাণীর বাজারের আর এক রাণীর আবির্ভাব হয়েছে।

শুধু, বেওয়ারিশ শবে যতক্ষণ পর্যন্ত শকুনের পাল না পড়ে, ততক্ষণ যেমন তার শব অভিষেক হয় না, তেমনি ছেঁউটি এখনো রাণী হিসাবে অভিষিক্ত হয়নি।

বাড়িউলিদের পোষা গুণ্ডারা মারামারিও করলে তাদের আড্ডায়। চণ্ডু-চরসের নেশায় বুঁদ স্তব্ধ সমুদ্রে 'ছেঁউটি' নামের বুড়বুড়ি কাটছে। বে-আইনি চোলাইয়ের গাঁজলা রসেও উপছে পড়ছে ছেঁউটির নাম।

রাণীর বাজারের প্রতিদিনের জীবনে, যে রাত্রি জাগে, সেটাও তার প্রত্যহের স্বাভাবিকতায় জাগে। কিন্তু তারো নীচে, অনেক নীচে, সুগভীর অন্ধকারে আরো একটি রাণীর বাজার জাগে দিনে রাত্রে। যেমন সর্বক্ষণের বাসস্থানে, মাটির তলের বায়ুহীন গর্তে, কুণ্ডলী পাকিয়ে জাগে বিষধর সাপ। তাকে সহজে টের পাওয়া যায় না। ভাড়াটে খুনী, ডাকাত, স্মাগলার, দাঙ্গাকারী ব্ল্যাকমেলার, নকলচিদের ভিড় সেখানে।

এই সংক্ষিপ্ততম পৌর এলাকা রাণীর বাজার অপরাধীদের তীর্থস্থল। থানায় গিয়ে, কিংবা সার্কেল ইনস্পেক্টরের অফিসে গিয়ে, যার ইচ্ছে সে দেখে আসতে পারে, মহকুমার মধ্যে থানার সীমানা ঘেরা ম্যাপটা। গ্রাফ পেপারের ঘরে ঘরে, কম্পাস স্কেলের মাপে যেখানে অপরাধের সংখ্যাতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে লাল রং সঙ্কেতে।

দেখা যাবে, মহকুমার সংক্ষিপ্ততম থানা রাণীর বাজারের ঘেরা চৌহদ্দিতে, লাল বিন্দুর ভিড় সবচেয়ে বেশি। গায়ে গায়ে চাপাচাপি, তর্‌তর্‌ করে উঠছে, তিল ধারণের জায়গা নেই, এত অপরাধের সংখ্যা। আশেপাশে থানাগুলির গায়ে এত কলঙ্ক নেই, যত আছে রাণীর বাজারের গায়ে।

সরকারি মতে, রাজনীতিও অপরাধ। তবে সে হিসাবের সংখ্যানু-লিখন অন্যত্র। অফিসের দেয়ালের সংখ্যাতত্ত্ব চার্টে তার হিসাব রাখা নেই।

রাণীর বাজারের হিসেবে কোন অসমতা নেই।

তার বহিস্রোত, আর অন্তস্রোত, ভাল আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার, সবকিছুতেই বজায় রেখেছে ভারসাম্য।

সেই নীচুতলার সুগভীর অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছেছে ছেউটির সংবাদ।

রাজা শোনে, রাজার কিছু করণীয় নেই।

বেচা এসে বকর বকর করে শুনিয়ে যায়, 'আমাকে সব বলে ছেউটি। বলে, বুঝতে পারিনে, কি করি। বুঝলি রাজা, বলে, শুনিচি, সে বাঁশী বাজিয়ে বাঁশী ফিরি করে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যেয়, 'কত কান পেতে থাকি, একদিনও শুনতে পাইনিকো। না হয়, ছেউটির দরজায় আসবে না, পথ দিয়ে একদিন বাজিয়ে যেতে বলো। তখন শুনলে মন আনচান করত, এখন না শুনলে মন আনচান করে।'

বেচার ক্লান্তি নেই। নেশার ঘোরে বলেই চলে। রাজা বলে, 'বাড়ি যা বেচা ঘুমোগে।' না, তা হবে না। বেচা বলে, 'কত জায়গায় তো যাস রাজা। একদিন বাজিয়ে যাস ওই রাস্তা দিয়ে। ছেউটি বলে, দুপুরে কত ফিরিয়ালা যায়, কতরকম করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, পাড়ায় মেয়েরা নানান জিনিস কেনে। সে সব আমার কেনার দরকার হয় না। একদিন এট্টা আনাড়ী বাঁশীওয়ালার বাঁশী শুনে ছুটে এয়েছি দরজায়। আ মরণ! আমারই ভুল। সে বাঁশী কি এমনি বাজে? তা বাঁশীতে ফুঁ দেবার বড় সাধ হল। বাঁশীওয়ালাকে ডেকে, একখানা বাঁশী নিয়ে ফুঁ দিলুম। অনেকদিন বাদে, বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে, মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। সেই একজনের বাঁশী—'

রাজাকে চেঁচিয়ে বলতে হয়, 'বুইচি বুইচি, তুই এবার যা বেচা।'

সে কথা বেচার কানে গেলে তো! সে বলেই চলে, 'ছেউটি বললে, এট্টা বাঁশী কিনেই রাখলুম দু' আনা দিয়ে। রেখে দিয়েছি ঘরে। কে আর বাজাবে? থাকে এমনি পড়ে।'

রাজার চোখের সামনে ভাসে, তার হাত থেকে বাঁশী নিয়ে, ফুঁ দিয়ে ছেউটি স্বর ফোটাবার চেষ্টা করছে।

বেচা চলে যায়। পাঁচি কেওরানির মত রাজাও ভাবে, লোকে বোঝে না।

কোনদিন বোঝে না। এ পৃথিবীতে সবকিছু হচ্ছে, সবকিছু ঘটছে। কিন্তু কেমন করে, লোকে বোঝে না।

বোঝে না বলেই মগন কেওরার, ছেউটির বয়সী বিধবা মেয়ে বিলাসীটা তার পিটুলীতলায় এসে ঘুরঘুর করে। বাপ মাকে ফাঁকি দিয়ে, রাত্রে এসে, উনুনে আগুন ধরিয়ে দেবে, ভাত বসিয়ে দেবে। তারপর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, আড়চোখে চেয়ে হেসে বলবে, 'ব্যাটাছেলে বুঝি আবার রাঁধতে পারে?'

রাজার মনে মোহের সঞ্চার করে বিলাসী। রাজা হাঁ করে চেয়ে থাকে। মনে হয়, ছেউটি কথা বলছে। সেই বিভ্রান্ত চোখের দিকে চেয়ে বিলাসী হেসে কুল পায় না। হাসির দমকে মেয়েটার শরীরে অকুলের ঢেউ দোলে। রাশ না-মানা মেয়ে, একেবারে রাজার কাছে এসে, চোখের দিকে চেয়ে বলে, 'দেখছ কি?'

রাজা বলে, 'তোকে দেখছি।'

'দেখে কি হয়?'

বিলাসীরই নিঃশ্বাস গায়ে লেগে সম্বিৎ পায় রাজা। তাড়াতাড়ি বলে, 'পালা বিলাসী, পাড়ার কেউ দেখলে আবার দুটো মন্দ কথা বলবে।'

বিলাসীর মধ্যেও সেই একই রক্ত। বলে, 'বলুক, আ-কাম করতে তো আসিনি। জবাব দিচ্ছ না কেন, ব্যাটাছেলে রাঁধতে পারে?'

'তবে কে রাঁধবে আমার জন্যে?'

'রাঁধার মানুষ একটা ঘরে আনলেই হয়।'

'মানুষ কোথায় রে?'

ভ্রূ কুঁচকে বলে বিলাসী, 'কেন, ছেউটি ছাড়া বুঝি মেয়ে নেই দেশে?'

বলে বিলাসী দাঁড়ায় না। চলে যায়।

তা বটে। রাজা রাগ করতে পারে না বিলাসীর ওপরে। কিন্তু বিলাসী বোঝে না। রাজা দ্বিতীয় ভাগে মনঃসংযোগ করে।

রাণীর বাজারে এখন রাজা বাঁশীওয়ালার বেশ নাম। পাড়ায়

পাড়ায় সবাই জানে, রাজা কেওরা জবর বাঁশী বাজায়। রাজা অবাক হয়ে ভাবে, রাণীর বাজারের ছেলেদের মতিগতি কেমন আশ্চর্য রকম বদলে গিয়েছে। জলসা, সভা হলে, তাকে এসে ধরে সবাই বলে, 'রাজাদা তোমাকে বাঁশী বাজাতে হবে আমাদের জলসায়।'

কেওরাপাড়ার ছেলেকে বলে ওরা দাদা। রাজা বাঁশীওয়ালা ওদের রাজাদা। বাপ মা শুনলে নিশ্চয়ই ওদের কান মলে দেবে।

ন'কড়ি একদিন তো দরখাস্তই লিখে দিলে রেডিওতে রাজার নামে। রাজা বাঁশী বাজাবে। তারপর একদিন ডাকও এল রাজার। তার নাকি পরীক্ষা হবে।

একলা একলাই গেল রাজা। ঘাড়ে করে মুলিটিও নিয়ে গিয়েছে। গিয়ে চিঠিটা দেখালে সে। সকলেই অবাক হয়ে গেল তাকে দেখে। তারপরে একটা ঘরে বসিয়ে দিয়ে, এক বাবু বললেন, 'বাজান আপনি।'

'বাজান আপনি?' খাতির করে তা হলে খুব। ভয়ে আর লজ্জায় প্রথমে ফুঁ দিতেই পারে না রাজা। তবু বাজাল। বাজাবার পর বাবু বললেন, 'বাড়ি যান, খবর দেওয়া হবে।'

কিছুদিন বাদে খবর এল, রাজা ফেল করেছে। মনে মনে ভাবল রাজা, তা কখনো হয়? রাণীর বাজারের লোকেরা ভালবেসে খুশি হয়। কলকাতার লোক কেন তা হবে?

তারপর একদিন রাজা, দুপুরে বাঁশী ফিরি করতে করতে মলপোঁতা পাড়ার মোড়ে এসে দাঁড়াল। মন বেশি উথালিপাথালি করলে বাঁশীতে ফুঁ দেওয়া যায় না। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল উত্তেজনায়।

তবু রাজা ফুঁ দিল বাঁশীতে। সুর তুলে হেঁটে গেল মলপোঁতা পাড়ার সরু চাপা গলিটার মধ্যে। যেতে যেতে রাস্তা পার হয়ে গেল। মলপোঁতা পাড়ার সীমানা শেষ হয়ে গেল। রাত্রি জেগেও দিনে যারা ঘুমোতে পারে না, সেইসব মেয়ে দু-একজন বসেছিল দরজায়। তারা তারিফ করে বললে, বাঃ বাঁশীওয়ালা বেশ বাজায়।

কিন্তু কই, আঁচল লুটিয়ে, চুল এলিয়ে, পড়িমরি করে কেউ তো ছুটে এল না পাগলিনীর মত। আশা ও খুশিতে রুদ্ধশ্বাসে ডাকলে না, 'তুমি? তাই আমার মন বলল। এ সুর যে আমার চেনা? এস।'

কিন্তু কেউ এল না।

মন চিরকাল আশা করতে ভালবাসে। আবার ফিরল রাজা একই পথ ধ'রে। হয়তো ছেউটি ঘুমিয়ে আছে। বাঁশী তার কানে যায়নি। এসেছে যখন, আজ শুনিয়ে যাবে রাজা। সুর চড়িয়ে, আরো ধীরে ধীরে পথ চলল সে। একটি মেয়ে ডেকে বললে, 'একদণ্ড দাঁড়িয়ে বাজিয়ে যাও না গো।'

তাই বাজালে রাজা। ছেউটি শুনতে পাবে ভাল করে। তারপরে আসবে।

কিন্তু গৎ ফুরলো, ছেউটির সাড়া পাওয়া গেল না। এটা কি মলপোঁতা পাড়া নয়? অচেনা পথ তো নয় রাজার। রাণীর বাজারের কোন পথই তার অচেনা নয়। রাস্তা ভুল করেনি সে। বরং, অন্যান্য মেয়ে এসে জুটলো দু-চারটি। কথা তাদের একটু বাঁকা, তাদের জীবনেরই মত, তবু খুশি হয়ে বললে, 'কেষ্ট ঠাকুরের মত মাইরি। বেড়ে বাজায়।'

কেউ তাকে ধরে রাখতে চায় কি না, নিজেদের মধ্যে হেসে হেসে ঢলে ঢলে, সে মস্‌করাও করলে তারা।

শেষে রাজা জিজ্ঞেসই করলে, 'ছেউটি থাকে না এ পাড়ায়?'

'ছেউটি? সে আবার কে?'

'কেন, অঘোর ঘোষ মশাইয়ের—'

'ও! অঘোর ঘোষের মেয়েমানুষ? বাবা, বলে, দাঙ্গা হয়ে যাবার দাখিল সে ছুঁড়িকে নিয়ে। আজকাল কি আর সেদিন আছে যে, পাড়ায় বসে একলা নিজের মেয়েমানুষ নিয়ে থাকবে? তা আবার যদি একটু পাতে দেবার মত হয়। পাড়া ছেড়ে তাকে ঘরে গিয়ে বসতে হবে তবে। ছেউটি চলে গেছে রাণীর গলিতে। ঘোষ বৃন্দাবন গুটিয়ে নিয়েছে।'

অনেক কথা লোকে বোঝে না ঠিকই। অনেক মানুষ নিজেও বোঝে না। রাজার আজ সেই অবস্থা। ছেউটিকে সে আজ দেখতে চায়। নিজের কাছেও এই ব্যাকুল বাসনার কোন কৈফিয়ত নেই রাজার।

তিন বছর বাদে, আজ যেন নিশিতে পেল তাকে। ছেউটির নিশি। মাঝে মাঝে মানুষকে এমনি নিশিতে পায়। রাণীর গলিতে এল রাজা। রাণী রোড, হালের ত্রৈলক্য ঘোষ রোডের ওপর থেকে গণিকাদের সরিয়ে, রাণী রোডের পিছনে, রাণীর গলিতে আস্তানা হয়েছে। রাণী রোডের ওপর এখন দোকান পসার। গোটা রাস্তাটাকেই একটি গঞ্জ বলা যায়।

রাণীর গলিতে অনেকবার এসেছে রাজা। এমন কিছু লুকনো রাস্তা তো নয়। ত্বনিয়ার লোককে, বাপ ছেলেকে, স্বামী স্ত্রীকে সবাইকে এ রাস্তায় হামেশা যাতায়াত করতে হয়। রাণীর বাজারের সব রাস্তাতেই রাণীরা আছে।

রাণীর গলিতে এলেই, রাণীর গলির বাড়ি যাওয়া বোঝায় না। মেয়েরা সবাই এমন কিছু অচেনা নয়, রাজাও তাদের অপরিচিত নয় একেবারে। সেটা এক শহরে বাসের মুখ দেখাদেখি পরিচয়।

কিন্তু ছেউটি আছে কোন্ বাড়িতে ?

রাণীর গলি শুধু রাত্রে জাগে না। রাণীর বাজারের সারাদিনের লেনদেনের সঙ্গে, বাইরের মানুষের যাওয়া-আসার মধ্যে রাণীর গলি দিনেও জাগে।

'কে ছেউটি ?'

নাম জানে না নাকি কেউ ? সবাই এক কথা জিজ্ঞেস করে। রাজা বলল একটি মেয়েকে, 'মলপোঁতা পাড়া থেকে এসেছে।'

'ও! সেই মেয়ে। তাই তো বলি, ছেউটি আবার কে ? তাকে তো সবাই রাণী বলে ডাকে। ওই তো, সৌরভিবালার মেয়ে অচলা বাড়িউলির ওখানে।' রাজাকে দেখে ঠোঁট উল্টে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি, 'সেখানে যাবার সখ কেন ? পাত্তা পাবে না।' তা না যদি দেয়, ক্ষতি নেই। তবু চিরকালের দোষটুকু তো খণ্ডন হবে রাজার।

অচলার বাড়ি ঢুকতেই মেয়ে-পুরুষের গলার মত্ত হাসি যেন তাড়া করে এল রাজাকে। বাড়ির বাইরে একটা মান্ধাতা আমলের ছ্যাকরা মোটরগাড়ি। তাও মাথায় ঢাকনা নেই, বসবার আসনগুলি উঁচু-নীচু ছেঁড়া। কবার হ্যাণ্ডেল মারলে চলে কে জানে!

তবু মোটরগাড়ি। তার পাশে আবার একটা পুরনো মোটর-সাইকেল।

হাসির মত্ত কলরবের মধ্যে, ছেউটির গলাটা এসে তীরের মত বিঁধল রাজার কানে। তখনো দিন। বেলা তিনটে বুঝি বাজে। তার পরেই ছেউটির তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'না' আর কিছুতেই পারব না।'

দু-তিনটি পুরুষ গলা শোনা গেল একসঙ্গে, 'আর একটু, এক ঢোক।'

পরমুহূর্তে বোধ হয় অচলারই গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'বলছে পারবে না, জবরদস্তি করছ কেন বাপু? দুকুরবেলা বেহুস হয়ে পড়ে থাকবে নাকি?'

'তাহলে একটা গান হোক।'

সমবেত গলার স্বরে, ছেউটির হাসি আবার শোনা গেল। বোঝা গেল, ছেউটির নেশা হয়েছে। হাসতে হাসতে সে অমানুষিক গলায় চিৎকার করতে লাগল, 'জানিনে, মাইরি জানিনে।'

'যা হোক গাইতে হবে।'

তারপরে কি ঘটল, কে জানে। সবাই একসঙ্গে আবার হেসে উঠল।

অচলা বাইরে এল। রাজাকে দেখে বললে, 'কি চাই গো? এখানে বাঁশী বেচতে এয়েছ?'

রাজা তখন পালাবে কি না ভাবছে। বলল, 'না। ছেউটির সঙ্গে একবারটি দেখা করতে এ'ছিলুম।'

'ছেউটি? ও, কেন?'

'দরকার ছেল।'

'এখন তো দেখা হবে না। ঘরে লোক রয়েছে। কি দরকার, বলে যাও।'

রাজা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, থাক তবে, এমন কিছু সাত-তাড়াতাড়ি নেই। পরে একসময় আসব।'

রাজা চলে যাচ্ছিল। এমন সময় লোকগুলি হুড়মুড় করে বাইরে চলে এল।

বিদায় নিচ্ছে তারা। যে ছেঁউটির হাত ধরেছিল, সে বলল, 'চলি তবে এখন, রাত্রে আসব।'

ছেঁউটি রীতিমত টলছে। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

সবাই একবার রাজাকে দেখল। তারপর বাইরে চলে গেল। যে ছেঁউটির হাত ধরেছিল, সে উঠল মোটরসাইকেলে। বাকিরা মোটরে দেখে মনে হয়, লোকগুলি চাকুরে, ব্যবসায়ী, ঠগ্, জোচ্চোর, সবই হতে পারে। ছেঁউটি প্রথমে দেখতে পায়নি রাজাকে। টলতে টলতে ঘরে চলে যাচ্ছিল।

অচলা বলল, 'এই রাণী, গ্যাখ্ কে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

'আবার কে?' বিরক্ত গলায় কথাটা বলে, ফিরেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল যেন ছেঁউটি। একেবারে সোজা হয়ে গেল। নেশাও কেটে গেল বুঝি। বলল, 'তুমি?'

রাজার জিভ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে, তাকে যেন ঠিক চেনে না। ছেঁউটি কি ঢ্যাঙা হয়েছে আরো? মুখখানি রোগা রোগা লাগছে। চোখ দুটি আরো বড়, কটাসে দৃষ্টি বড় বেশী খরো দেখাচ্ছে। কেওরাপাড়ায় লাবণ্য হয়তো তেমন ছিল না, তবু স্বাস্থ্যের উদ্ধত দীপ্তি ছিল। এখন ছেঁউটির সারা গায়ে যৌবন যেন রোখ পাকিয়ে আছে। বড় তীক্ষ্ণ, খরো, কটু হয়ে চোখে লাগছে তার খোঁচা খোঁচা ভাব।

ছেঁউটি তো এখন আর সেই কেওরাপাড়ার গোপন অভিসারিকাটি নেই। ছুটে কাছে এসে রাজার হাত ধরল সে।

কিন্তু রাজা যে সেই কেওরাপাড়ার ছেলেটাই আছে। ছেঁউটি এসে সকলের সামনে তার হাত ধরলে, তার পুরনো সঙ্কোচ মাথা চাড়া দিয়ে

ওঠে। লোকলজ্জায় চকিত হয় মন। আরো অনেক কিছু হয় মনের মধ্যে, শরীরের মধ্যে, কিন্তু ছেউটি বোধ হয় আজ আর সেসব বোঝে না। তার এই অসঙ্কোচ স্বাভাবিকতায়, রাজার মনে হল, এ সেই ছেউটি নয়।

ছেউটি বলল, 'এতদিন বলে বলে তবে এলে?'

রাজা হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এলুম। ভাবলুম, দেখে আসি একবারটি।' কিন্তু রাজার মন বলছিল, কেন এলাম? এর চেয়ে না আসাই ছিল বুঝি ভাল।

অচলা ছাড়াও আরো দু-তিনজন রাণীর ব্যাপার দেখছিল বাঁশী-ওয়ালার সঙ্গে। অচলা একটু যেন বিরক্ত ভাবেই বলল, 'নে রাণী, একটু গা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে নি গে। সারাদিন ধরে বিশ্রাম নেই। সন্ধ্যে হলেই তো আবার সব আসতে আরম্ভ করবে।'

ছেউটি বলল, 'আসুকগে বাপু। এখন আমি দুটো কথা না বলে পারবো না।'

বোঝা গেল, এখানে ছেউটির কথার ও ভ্রূকুটির দাম আছে।

অচলা রাজাকেই চোখে খুঁড়ে চলে গেল।

ছেউটি তখন হাত ধরে টানছে রাজাকে। রাজা তার ঘরের দরজায় এসে বলল, 'থাক্ না, তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর না হয়।'

ছেউটির দু'চোখে অভিমান ও বিস্ময়। বলল, 'কি বললে আমাকে তুমি 'তুমি' করে বলছ?'

ছেউটির চোখের দিকে চেয়ে রাজার যেন অনুশোচনা হল। তবু বলল, 'তা এখন কি আর—'

'তা বুঝিচি।' ছেউটি বলল, 'এখন আমি বেবুশ্যে হয়ে গেছি, তুমি আমার সঙ্গে সেরকম করে কথা বলতে চাও।'

রাজা বলল, 'না, তা নয়।'

ছেউটি সে কথা শুনবে না। বললে, 'জানি, মনে মনে ঘেন্না করছ, রাগ করছ এসব দেখে। তা আমি কি করব, বল্?'

ছেউটি কি করবে? কী জানে ছেউটি? রাজা হেসে ফেলল। বলল,

'না হয় তুই তোকারিই করছি। কেমন আছিস বল্ ?'

রাজার হাতটি আরো জোর করে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল ছেউটি। বলল, 'তুমি বাপু অনেক বদলে গেছ। শুনিচি সবই। আজকাল নাকি বই পড়ছ রাত করে, খবরের কাগজ পড়ে শোনাচ্ছ পাড়ার লোকেদের। বিলাসী আসে, তুমি ফিরেও তাকাও না।'

রাজা তখন ঘরের দৃশ্য দেখছে। ছেউটির বিছানা পাতা খাট। নীচে ও গদীর ওপর চাদর। ছাইদানিতে অজস্র পোড়া সিগারেট, মদের আর সোডার শূন্য বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেয়ালে সাহেব মেমদের আদর সোহাগের ছবি।

রাজার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'ওসব দেখতে হবে না। এস, এদিকে এসে বসবে।'

রাজা চোখ ফিরিয়ে তাকাল ছেউটির দিকে। কেওরা ছেলের বুকেও যে এমন করে অকারণ কষ্ট লাগে, তা কে জানত। রাজার মনটা যেন পুড়ছে। আবার বলল, 'কেমন আছিস ছেউটি, বললিনি তো।'

ছেউটি বলল, 'চোখেই তো দেখলে, কেমন আছি। তা এতবার আসতে বলিচি, আসনি। আজ যে মনে পড়ল বড় ?'

রাজাকে কেমন বোকা বোকা দেখাতে লাগল। হেসে বলল, 'এসে পড়লুম।'

রাজার ভয় হল, ছেউটি না আবার কাঁদতে বসে। ভাব-সাব ভাল বোধ হচ্ছে না। ঘন হয়ে বসে, রাজার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

রাজা বলল, 'কি হল রে ছেউটি ?'

ছেউটি রাজার হাঁটুতে হাত দিয়ে বলল, 'না বাপু, তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। এসব আমার পরেই রাগ। তা আমি কি জানি বল ?'

রাজা বলল, 'তোর পরেই রাগ করে কি হবে বল্। শোন্ ছেউটি আজ যাই, আর একদিন আসব।'

'ইস্! এখুনি যাবে! রাগ কর, আর যাই কর, এখুনি আমি যেতে দেব না তোমাকে।'

'শরীরটা নষ্ট করবি। একটু ঘুমো।'

'তোমাকে ওসব দেখতে হবে না তো।'

'এই তো দেখলুম, নেশায় টলছিলি।'

'তুমি কাটিয়ে দিলে যে।'

বলে ছেউটি উঠল। আলমারি খুলে বার করল একটি বাঁশী। কাছে এসে বলল, 'অনেকদিন থেকে রেখে দিয়েছি তুলে, সেই মলপোঁতা পাড়ায় থাকতে। আমার এই বাঁশীখানি বাজাতে হবে তোমাকে আজ।'

রাজা আপত্তি করল, 'আজ থাক ছেউটি। বাঁশী অন্যদিন এসে বাজাব।'

ছেউটি তা শুনবে না। বললে, 'পায়ে পড়ি, বাজাও, লোকের কাছে কত মিছে কথা বলি, তোমার সঙ্গে সেই কপটতা করতে পারব না। কতদিন শুনিনিকো। আমার কষ্ট হয়, খালি মনে পড়ে।'

কষ্ট হয় ছেউটির। রাজার বাঁশী শোনার জন্যেই ছেউটির কষ্ট। বাঁশীওয়ালা রাজা, সেটুকু না হয় বাজিয়েই যাবে।

রাজা বাঁশীখানি হাতে নিয়ে দেখে বলল, 'জলে ভিজিয়ে নিয়ে আয় ছেউটি। অনেকদিন ধরে রয়েছে, স্বর শুকিয়ে গেছে।'

বাঁশী জলে ভিজিয়ে নিয়ে এল ছেউটি।

রাজা বলল, 'কোন্ গান শুনতে চাস বল?'

রাজার গলার সুরে যেন শেষ বিদায়ের রাগিনী শুনিয়ে যাবে, আর কোনদিন আসবে না। তাই, ছেউটি যা শুনতে চায়, তাই বাজাবে সে।

ছেউটি বলল,' সেই গানখানি বাজাও

আজি সখির প্রাণে গোপন অভিসার
দারুণ নিশি গো, আসিল না সে
পরাণ জুড়িয়ে তার।'

কেন? আজ এই গান শুনতে চায় কেন ছেউটি। রাজা বলল, 'এ

না বড় টানপোড়েনের গান ছেউটি, দুঃখের ?'

ছেউটি বলল, 'সুখের গান তো অনেক শুনি, ভাল লাগে না। মিছিমিছি ঠকানো ঠকানো মনে হয়।'

রাজা গম্ভীর হয়ে গেল। ছেউটি আবার এসব কথা শিখেছে কেমন করে? বাজাল রাজা। মন্দ নয় বাঁশীটা। প্রথম প্রথম জালে জড়ানো অস্পষ্ট লাগলো সুর। তারপরে খুলল।

কয়েকজন ছুটে এল ছেউটির দরজায়। ছেউটিকে তারা অহংকারী বলেই জানে। কিন্তু আজ ছেউটি বলল, 'এস, বস ঘরে এসে।'

কয়েকজন বসল।

রাজা গান শেষ করল। আবার বাজাল ঘুরিয়ে।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনল। শেষ হলে সকলেরই নিশ্বাস পড়ল। অনেকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল রাজার। ইতিমধ্যে অন্য মেয়েদের মধ্যেই কে যেন রাজার জন্য চা আর জিলিপী আনিয়েছে।

রাজা খেল। আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেল অন্য মেয়েরা।

রাজা ছেউটির দিকে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে, রাজার ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে এসেছে ছেউটি। চোখে তার নেশার আমেজ যেন।

রাজার ঘাড়ের উপর মুখ রেখে বলল ছেউটি, 'বিলাসীকে নিয়ে থাক না কেন?'

রাজা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'সে কৈফিয়ত তোকে দিতে হবে বুঝি? সর্ এবার, উঠি।'

'না।'

না? ছেউটির দিকে আবার তাকাল রাজা। ছেউটি হাত বাড়িয়ে রাজার গলা ধরল।

রাজার এবারকার কষ্টটা মর্মান্তিক বোধ হল। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল তার। ছেউটি তাকে ভুল করেছে, ভুল বুঝেছে।

ছেউটি বলল, 'আজ যেতে দেবনাকো। রাতটা থেকে যাও।'

সর্বনাশী শুধু বাঁশী শুনতে চায় না। চিরদিন ধরে আগুন জীইয়ে

রাখতে চায় রাজার প্রাণে। বেঁধে রাখতে চায় চিরকাল ধরে।
বলল সে, 'ছাড়্ ছেউটি। অমন করিস নে। রাতে তোর কাছে থাকতে
পারব না। সেজন্যে তোর কাছে আসিনি।'

ছেউটির চোখে অসহায় কষ্ট। ওর দেহের সম্বল ছাড়াও যে
রাজার আর কোন প্রতিদানের আশা থাকতে পারে, সেটা ছেউটির
অভিজ্ঞতায় বুঝি নেই। তাই রুদ্ধ গলায় বলল রাণীর গলির হালের
রাণী, 'কোনদিন চাওনি আমাকে? আর চাওনাকো?'

পাঁচি কেওরানির ছেলে রাজা কেওরা, তারো বুকে এসে কথা
আটকে যায়। বুকের কথা আটকানো বাষ্পটাকে জোরে হেসে হেসে
উড়িয়ে দিতে চাইল রাজা। দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'চলি রে।'

ছেউটি বলল, 'বললে না?'

'কি বলব? ছেউটি, তুই বড় বোকা।'

'আর আসবে না?'

'আসব।'

'কবে?'

'যবে বলবি?'

'রোজ রোজ।'

'রোজ রোজ?'

'হ্যাঁ, রোজ, একবার করে।'

রাজা তাকিয়ে দেখল ছেউটির দিকে। যার দু' চোখ ভরে রাজার
বন্দীদশার কয়েদখানা আঁটা হয়ে আছে। রাতে কোনদিন থাকবে
না রাজা, কিন্তু আসতে তাকে হবে।

কেন? না, মেয়েটা আর কেউ নয়, ছেউটি।

রাজা বলল, 'রোজ না হোক, আসব। কিন্তু কাঁদিস তো একদিনও
আসব না।'

ছেউটির চোখে বুঝি জল আসছিল। বলল, 'আচ্ছা।' বলে ঠোঁটে
ঠোঁট চেপে রইল।

রাজা বেরিয়ে এল।

এই আমার রাণীর বাজারের কালের রাখালের আদি বৃত্তান্ত। এখন রোজ স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ায়। সময় অসময় নেই। যখন প্রাণ চায়।

আমি রাণীর বাজারের সর্বোচ্চ চিলেকোঠায় বসে, ঘুলঘুলি দিয়ে তার সুখদুঃখ, আলো-আঁধার, জীবনমৃত্যু, পাপপুণ্যের ছবি দেখছি নিরন্তর, আমার সেই ছবির রঙে ও পটে রাজার বাঁশীর সুর একাত্ম হয়ে যায়। ও আমাকে মনে করিয়ে দেয়, যা দেখছি, যা শুনছি, সবই কালের কোলে হারিয়ে যাচ্ছে। সকলের মনে থাক্ বা না থাক্, আমি যেন ভুলে না যাই, এসব কিছুই থাকবে না। সবাই তার কালের কাজ শেষ করে যাচ্ছে।

শুধু টের পাইনে, কালের বুকে সকলের সব সুর কেমন করে বেজে ওঠে রাজার বাঁশীতে তার নিজের কথা তাতে কতটুকুনি আছে।

কারণ, রাজাকে দেখেছি, রাণীর গলিতে সে যায় প্রায়ই, ছেউটির সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে সুরটা রাজা বাজিয়ে ফেরে না।

নিজের জন্য বাজানোটা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে ও।

যেন যুগ যাবে, পার হয়ে যাবে শতাব্দী, তবু রাজা কেওরা পাড়ায় ফিরে যাবার পথে, রাণীর গলিতে যাবে চিরদিন। শুধু সেই সুরটুকুই বাজবে না কালের রাখালের বাঁশীতে।

রাজা যেন মহাকালের মত নির্বিকার।

তাই, সন্ধ্যাবেলা আজও জীবনের খেয়া-পাড়ির শেষ রাগিণী ধরেছে। সৌরভীবালা মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। রাণীর বাজারের প্রবীণা পণ্যাঙ্গনা।

রাণীর বাজারের বিচিত্র ইতিহাসের অনেক কথা যার গলিত মাংসের ভাঁজে ভাঁজে লেখা রয়েছে। যে ইতিহাস পাপ, ধ্বংস ও অপূর্ণ বাসনার ইতিহাস।

আমি দেখছি, লোলচর্ম বৃদ্ধ ন্যায়তীর্থ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। যার সারা গায়ের বলীরেখায় রাণীর বাজারের ধর্ম ও পাণ্ডিত্য, নবদ্বীপ ও বারাণসী জয়, ক্ষমা ও কূটবুদ্ধিহীন দান পুণ্যের ইতিহাস রয়েছে লেখা। একজন রাণীর গলিতে। একজন দ্বিজপাড়ায়। সবচেয়ে

আশ্চর্য, সৌরভীবালা আর ন্যায়তীর্থ, উভয়েই সমবয়েসী। দুজনেরই নিরানব্বুই বছর বয়স, আর দুজনেই রাণীর বাজারেরই সন্তান।

সৌরভীবালা তার জীবনে, যুবক নৈয়ায়িককে দেখেছে। আড়াল আবডাল থেকে। কিন্তু ন্যায়তীর্থ কোনদিন দেখেননি সৌরভীবালাকে।

কবে বুঝি একদিন, সত্তর বছর আগে, গঙ্গার ঘাটে সৌরভী ঘোমটায় মুখ ঢেকে, ভেজা কাপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে, বাইশ বছরের চণ্ডীচরণকে প্রণাম করেছিল মাটিতে কপাল ঠুকে। তবু, কুলটা তার কূট ছলনাকে পারেনি জয় করতে। ভরা যৌবনের সিক্ত বসন এলো-মেলো হয়েছিল। ঘোমটার ফাঁকে, তার কালো চোখের দ্যুতি বেঁধাতে চেয়েছিল নৈয়ায়িকের চোখে।

চণ্ডীচরণ হাত তুলে বলেছিলেন, 'জয়স্তু। সুখী হও মা।'

সৌরভী ঠোঁট মুচকে হেসে. মনে মনে বলেছিল, 'মুখপুড়ি।'

গালাগালটা নিজেকেই দিয়েছিল সে। নিজের ছলনার জন্যও বটে, ব্যর্থতার জন্যও বটে।

সেকথা সৌরভীর মনে থাকতে পারে, ন্যায়তীর্থের নেই। কারণ পথে চলতে প্রণাম এবং আশীর্বাদ তার নেওয়া ও দেওয়ার কাজ চলতেই থাকে। কাকে চিনে রাখবেন ?

আজ সেই দুজনেরই মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

সৌরভীবালার প্রবৃত্তির ইতিহাস অঙ্কিত গায়ে আজ কাপড় নেই। কোন রকম লজ্জা নিবারণ হয়েছে মাত্র। শতাধিক বছরের পুরনো নীচু বাড়িটার পশ্চিম দিকে, ছোট জানালা দিয়ে আকাশটা আজও কেমন করে মুখ বাড়িয়ে আছে, সেটা বিস্ময়েরই। সৌরভীর দৃষ্টি আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবু, ঘনায়মান সন্ধ্যার লাল ছোপ ধরা উঁকি-দেওয়া আকাশটার দিকেই সৌরভীবালার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে।

রাণীর বাজারের বুড়ো ডাক্তারবাবু অভয় চাটুয্যে এসেছেন। উকিল গগন বসু এসেছেন কাগজপত্র নিয়ে। তাঁদের ডেকে আনা হয়েছে। ডেকে এনেছে সৌরভীর সন্তানেরা। যাদের সে খাতক, ঋণ শোধ করে মরতে হবে তাকে।

অভয় চাটুয্যে সৌরভীর নাড়ি দেখলেন। একটু যেন অবাক হয়েই বললেন, 'এখনো তো তেমন অবস্থা দেখছিনে !'

সকলেই ডাক্তারের দিকে তাকাল।

অচলা আর চঞ্চলা, সেরভীর দুই প্রৌঢ়া মেয়ে ও এক ছেলে শ্রীনিবাস এসেছে। সৌরভীবালার ঘর ভর্তি।

সৌরভীবালা হাত তুলল। সবাই এক যোগে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে।

সৌরভী বলল, মোটা ভাঙা ভাঙা গলায়, 'শিবি।'

সবাই এক যোগে চোখ তুলল। কোথায় শিবি? শিবানি!

চঞ্চলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরে নিয়ে এল ডেকে শিবানীকে। চঞ্চলার চোদ্দ বছরের মেয়ে শিবানী, সৌরভীর একমাত্র দৌহিত্রী। চঞ্চলার পঁয়তাল্লিশ বছরের গর্ভজাতা শিবানী।

শিবানীর হাতে পেন্সিল। গায়ে লিনেনের লেসবসানো ফ্রক। ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে লতিয়ে পড়েছে বেণী।

সৌরভী, অচলা, চঞ্চলা, শ্রীনিবাস, সকলেই শ্যামবর্ণ।

শিবানী ফর্সা। রং এখনও কাঁচা সোনার মত, লালিমা লাগেনি বিশেষ, সোনার পাকা রংয়ের মত। মুখ একটু লম্বা, ভরাট হওয়ার অপেক্ষায় আছে। বড় বড় চোখ, সরল চাউনি। সব মিলিয়ে বুদ্ধি ও সুশ্রীতে শিবানীর মুখে একটি অপরূপের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। সেকাল হলে শিবানীর শাড়ি পরাবার সময় হয়েছে। একালেও তার এই বয়সের সন্ধিক্ষণে, লিনেনের ফ্রকের ওপরে কিশোরী-স্ফুটন চাপা থাকেনি।

শিবানীর চোখে লজ্জা ও বিরক্তি। চঞ্চলাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি করব ?'

চঞ্চলা ভ্রূকুটি করে, রাগ চেপে বলল, 'দিদিমার কাছে যা, ডাকছে।'

সৌরভীবালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শিবানী।

সৌরভীবালা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে। তারপর

হাত তুলে কাছে ডাকল। শিবানী কাছে গেল। সৌরভী তার গায়ে হাত দিল। ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পড়ছিলি ?'

'হ্যাঁ।'

'মাস্টার এয়েছে পড়াতে ?'

'হ্যাঁ।'

'গান শিখবি না আজ ?'

শিবানী বলল, 'গানের মাস্টার কাল আসবে।'

'আর নাচের ?'

'আজ এসেছিল বিকেলে।'

বৃদ্ধ উকীল গগন বসু যেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন শিবানীর দিকে। আর গগনবাবুর সেই বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়েছিল শ্রীনিবাস। সৌরভীর ছেলে চিনিবাস খাঁ, রাণী রোডের সবচেয়ে বড় মুদীখানা যার। খালি গা, মস্ত ভুঁড়ি, আপাতনিরীহ ছোট ছোট চোখ দুটি দিয়ে সে যেন অতিপাতি করে খুঁজছে কিছু গগনবাবুর মুখে, আর ঘন ঘন তাকাচ্ছে গগনবাবুর হাতের কাগজপত্রের দিকে।

সৌরভীবালা তেমনি তাকিয়ে আছে শিবানীর দিকে।

রাণীর বাজারের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে শিবানী। গানের গলা আছে। সৌরভীবালা শুনেছে সেই গান। নাচ শিখছে শিবানী। সে নাচ সৌরভীবালাদের যুগে ছিল না। একালে যে নাচের মোহিনীশক্তি আরো বেশী।

সৌরভী তার দৌহিত্রীর মধ্যে, আধুনিক সরস্বতীর পরম বিস্ময় দেখেছে। রাণীর বাজারের প্রাচীনা রাণীর দৌহিত্রীর দৌহিত্রীকে সে দেখছে অবাক হয়ে, রাণীর বাজারের নতুন ইতিহাসের পিপাসিত চোখ ইতিমধ্যেই যার ওপর দৃষ্টিপাত করেছে। সৌরভীবালাও পিছিয়ে নেই, যুগকে ডেকে এনেছে তার দৌহিত্রী। যে দৌহিত্রী দেহ পণ্য করুক বা না করুক, রাণীর বাজারের রাণী রোডের ঐতিহ্য চিরদিন রয়ে গেল।

এইটুকু সুখ সৌরভীবালার। মরণে তার কোন দুঃখ নেই। চঞ্চলার মেয়ে শিবানী আছে। যে লেখাপড়া, নাচ, গান শিখেছে। যে-রঙ্গিণী

হতে পারবে, কিন্তু কলম বাগিয়ে ধরে দলিলের লেখা পড়ে পারবে অর্থোদ্ধার করতে।

রাণীর বাজারের সজ্জন-গৃহস্থ বৃদ্ধ ডাক্তার আর উকীলবাবু তাঁদের যৌবনে যে আকর্ষণ কোনদিন অনুভব করেননি অচলা কিংবা চঞ্চলাকে দেখে, তাঁদেরই আধুনিক বংশধরদের সর্বনাশকে যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন কুলটা দৌহিত্রী শিবানীর মধ্যে।

নিশ্চিন্তে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল সৌরভীবালা। দেহে তার এখনো যন্ত্রণার অনুভূতি ক্ষয় হয়নি। দেরী কেন ? মৃত্যু আসুক। অতীতের যে স্বপ্নকে সে দেখছে, নিশ্চিন্তে দেখা হোক।

সৌরভীবালা শুরুর স্বপ্ন দেখছে।

একে একে সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল। সময় হয়নি এখনো।

পশ্চিমের উঁকি দেওয়া আকাশটায় রং ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। আজকের দিনশেষের অতীতে ঢাকা পড়ে যাবে আকাশটা। তার আগে অতীতে ফিরে যেতে চায় সৌরভী। শমন তাকে মনে মনে আলাপের সময় দিয়েছে।

কালের রাখাল সুর ধরেছে ঠিক।

সৌরভীবালা ভাবছিল, শিবানী কার ঔরসজাত ?

সৌরভীবালা কার ঔরসজাত ?

কোন ব্যক্তি নয়, রাণীর বাজারের প্রবৃত্তির কন্যা তারা। আমরণ যাদের বৈধব্য নেই।

সেই চির-সধবা রাণীর গর্ভে, এই ঘরেই জন্মেছিল সৌরভী। তার সেই মাকে মনে পড়ছে তার।

এই একতলা নীচু বাড়িটাকে সেদিন খুঁজে বার করতে হত না। এমন করে চারিদিক থেকে পিষে মারার সারবন্দী উঁচু বাড়িগুলি সেদিন ভবিষ্যতের কালে ছিল ঢাকা। গঙ্গার ঘাটে যাবার সদর সড়কের ওপর অনেক গাছ-গাছলির ছায়ায়, আশেপাশে দুলে বাগ্‌দী পাড়ার সীমানায় এই বাড়ি ছিল সেদিন বাগানবাড়ি।

গোপিকানাথ পালের বাগানবাড়ি। স্থাবর ও অ-স্থাবর সম্পাত্তিতে

প্রায় শতাব্দীপূর্বে, যে সৎশুদ্র রাণীর বাজারে ছিল প্রায় অদ্বিতীয়।

রাণীর বাজারের সদর দেউড়ি তখন গঙ্গার ঘাটে। গোটা রাণী রোডের সুবৃহৎ বাজার তখন গঙ্গার ধারে. এখন যেখানে চটকলের সাহেবদের পাঁচিল ঢাকা খেলার মাঠ আর কুঠি হয়েছে। আজ স্বপ্নের মত মনে হয়। সৌরভীর মনে হয়, সেদিনের ঘটনা। এই ঘরে বসে সেই গঞ্জ দেখা যেত। যে ঘর থেকে আজ গঙ্গার পাড়টুকুও দেখা যায় না।

তখন সেই গঞ্জ ছিল গোটা চাকলার একমাত্র বেচাকেনা লেনদেনের জায়গা। গঞ্জের আকাশ খুঁচিয়ে, গায়ে গায়ে পাশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকত নৌকার মাস্তুল। বড় বড় মহাজনী নৌকা থেকে, ভাউলে, পানসী সবরকম ভরতি হয়ে থাকত গঞ্জের ঘাটে। পূবের ধান চাল, পশ্চিমের ডাল ঘি গুড় বোঝাই নৌকায় আর বিদেশী মাল্লারা ভিড় করে থাকত সব সময়।

রাণীর বাজারের জংশন স্টেশনে তখন সাপের মত আঁকাবাঁকা বার-চৌদ্দটা লাইনের জটিলতা ছিল না। একটি লাইন, ছোট একটি ঘর। নদীয়া জেলায় যাবার বড় সড়কের ধার ঘেঁষে ছিল। লোকের আনাগোনা ছিল কম। রাত্রে একটি বাতি জ্বলত টিম্ টিম্ করে। সারাদিন দু'তিনখানা গাড়ি যাতায়াত করত। পুরনো গঞ্জে তার শব্দটুকুও পৌছত না।

রাত্রিবেলা গঞ্জে আলো জ্বলত। গঙ্গার ধার আলোয় আলোকময় হয়ে থাকত তখন। সেই বাজারের মালিক ছিল গোপিকানাথ। শুধু 'তোলা' ছিল না, নিজেও ছিল বড় মহাজন। মায়ের কাছে শুনেছে সৌরভী. বহরমপুরের এক কাঁসারির ঘরের বৌ ছিল সে। বয়স তখন বছর আঠার। সেই সময়ে সে এখানে আসে।

রাণীর ভাষায় 'কি কুক্ষণে পাড়ার মদন মুখুজ্জের চোখে পড়ে গেলুম। মানুষটা চোখের দিকে তাকালে বুকের মধ্যে কাঁপত, কিন্তু স্থির থাকতে পারতুম না। বারে বারে দেখতে ইচ্ছে করত। একদিন মদন ঠাকুর ইশারা করলে। সে মুহূর্তে ঘর ছাড়লুম। ঘাটে নৌকা ছিল। তখন ঘোর সন্ধ্যে। আষাঢ় মাস। কয়েকদিনের মধ্যেই রথ। নৌকা

ভেসে চলল দক্ষিণে, আমিও ভাসলুম ঠাকুরের সঙ্গে। তিনদিন নৌকায় ঠাকুরের সংসার করে, ধীরে ধীরে মাহেশে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড রথ, মস্ত মেলা। মাঝি বিশ্বাসী ছিল। ঠাকুর আমাকে নৌকায় রেখে কোথায় যেন গেল। মাঝরাত্রে ফিরে এল মাতাল হয়ে। সেই আমারও প্রথম মদ খাওয়া, ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে। দেখলাম, ঠাকুরের কোঁচরে বাঁধা রাশি রাশি টাকা! কোথায় পেল অত টাকা? না, জুয়া খেলে। তার পরদিন ঠাকুর চলে গেল। ফিরে এল প্রথম রাত্রে। তখন ঠাকুরের চেহারা দেখে আমার ভয় করতে লাগল। চোখে তার খুনের নেশা যেন। বলল, এই ললিতা, আয় তো আমার সঙ্গে। বলে তর্ সইল না। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। কোথায় একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলল। গাঁজা মদের ধূম সেখানে। দেখলাম, ঘুঁটি সাজিয়ে জুয়া খেলা হচ্ছে। আমাকে পাশে বসিয়ে, ঠাকুর খেলা আরম্ভ করল আবার। দেখলাম সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে লুভিষ্টির মত। ঠাকুর হারতে লাগল। শেষে, শেষদান চাললে ঠাকুর, চেলে হারলে আর আমাকে একটা লোকের ঘাড়ের উপর ঠেলে ফেলে দিয়ে বললে, নাও। বলে চলে গেল। ঠাকুর আমাকে বউ বলে, শেষ দানে হেরে দিয়ে গেল জুয়াড়ির হাতে। চিৎকার করে কাঁদতে গেলুম। মুখ চেপে ধরলে আমাকে। কাঁসাতে আমার মন মানেনি, বুঝি সোনায় হাত বাড়িয়েছিলুম। রং আমার ঘুচে গেল, সে রাত্রে তিন বার বিক্রি হয়ে গেলুম। তারপর, কয়েক মাস নানান জনের হাতফেরতা হয়ে, চাঁপদানি-শেওড়ফুলি-চন্দননগর হয়ে এখানে। এখানে আসার এক বছর পরে তুই (সৌরভী) হলি। তারপর পাল মহাজনের চোখে পড়ে গেলুম। পাল প্রথম বাজারেই রেখেছিল আমাকে। আরো দু'চারটে মেয়েমানুষ ছিল। কিন্তু পাল আমাকে কি চোখে দেখলে কে জানে। তখন পালের বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। ঘরে তার দশ বছরের ছেলে। পঁচিশ বছরের নাম করা রূপসী পাল-বউ।

পালের বাড়ির ধুলো, হাতের ময়লা, সবই নাকি সোনা। শুধু মেয়ে মানুষ রাখা নয়, পাল আমার বড় ন্যাওটা হয়ে গেল। সর্বক্ষণ

কাছে থাকতে ইচ্ছে, তাই এই বাড়ি করে দিলে। একেবারে লিখেপড়ে দিলে আমাকে। কায়েত ঘোষবাবুদেরও তখন কোঁচা ঝাড়লে সোনা। খাঁয়েদেরও মুঠিতে রূপো। দ্বিজপাড়ার চাটুয্যেরা মস্ত জমিদার।···কি একটা নাম রটে গেল আমার, অমুক পালের (রাণী গোপিকানাথের নাম নিত না) মেয়েমানুষের মত মেয়েমানুষ নাকি আর হয় না। পালের সঙ্গে রেষারেষি করে, সবাই কুটনী পাঠালে আমার কাছে, চলে এস। আমি পালকে ছেড়ে যাইনি। আর সেই সময়েই, খাঁয়েদের পাড়ায় মল পাওয়া গেল মাটির তলায়। তাই মলপোঁতা পাড়া নাম হয়ে গেল।

ব্যাপার কি ?

না, নকুড় খাঁর গুটিতিনেক মেয়েমানুষ ছিল। তার মধ্যে ছোটটি বুঝি নকুড় খাঁয়ের ভাইয়ের সঙ্গে তলে তলে জড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, নকুড় সেই মেয়েটিকে যে ভাবে মেরেছিল, সে সব কথা রাণীর মত মেয়েমানুষেরও মুখে আনতে নেই। এমন কুৎসিত, এমন ভয়ঙ্কর। মেরে লাস গুম করে দিয়েছিল। মেয়েটার পায়ের মল খসিয়ে নিয়েছিল। সেই মল পুঁতে রেখেছিল মাটিতে। নকুড়ের ভাই লাগল নকুড়ের পেছনে। সে-ই খোঁজ খবর করে সব বার করে। পুলিসে টাকা গেল, নকুড় ধরা পড়ল না। সেই থেকে পাড়ার নাম হয়ে গেল মলপোঁতা পাড়া।'

না, সে ভয় রাণী পায়নি। কারণ সেও গোপিকানাথের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন তার কাছে আরো কিছু চাইতে বললে গোপিকানাথ রাণীকে। যে মুহূর্তে বললে, সেই মুহূর্তে গোপিকানাথের কপালে শমন তার মৃত্যুর দিন ও ক্ষণ লিখে দিলে।

কি চায় রাণী, চেয়ে নিক। 'জমি ?'

'না।'

'নতুন বাড়ি ?'

'না।'

'তবে ? জড়োয়া গহনা ?'

'না।'

'টাকা ?'

'তাও নয়।'

যেন একটা খেলা। খেলাচ্ছলেই হাসতে হাসতে বলল, 'বাজারটা দাও।'

'বাজার ? বাজার নিয়ে তুই কি করবি রাণী ?'

'কি আবার করব। তোলা তুলব, খাব।'

মিথ্যে বলবে না রাণী, সে আশা করে চায়নি। গোপিকানাথের খেয়ালের সঙ্গে সেও খেয়ালীপনার খুনসুটি করছিল।

কয়েকদিন পরে গোপিকানাথ এল। সঙ্গে মেলাই লোক। সব লোকই বাজারের। গোপিকানাথ সরকারি স্ট্যাম্পের কাগজ দিলে রাণীর হাতে। বললে, 'নে, এটা।'

'কি ?'

'ত্মাখ্ না কি। তারপর বাইরে যা। তোর সঙ্গে বাজারের লোকেরা দেখা করতে এসেছে।'

কাগজখানি হাতে নিয়ে বাইরে গেল রাণী। সবাই এসে রাণীর সামনে পয়সা দিয়ে যেতে লাগল।

'কি এসব ?'

বাজারের তোলা প্রথম ঘরে বয়ে দিতে এসেছে নতুন মনিবানকে।

আঁচল ভরে পয়সা নিয়ে, ঘরে ঢুকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাণী গোপিকানাথের দিকে।

গোপিকানাথ বলল, 'কি, অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস যে বড় ? তোলা তুলবি আর খাবি, বলছিলি না ? তাই দিয়ে দিলুম। ভাল করেছিস, জীবনে আর কারুর কাছে হাত পাততে হবে না। কারণ গঙ্গা নদী যদি কোনদিন বানে ভেঙে না নিয়ে যায়, তবে এ বাজার রইল তোর, তোর মেয়ের চিরদিনের জন্য।'

মনটা কেমন করতে লাগল রাণীর। বলল, 'না, এটা তুমি ঠিক করনি বাবুসাহেব। তোমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম বলে, সত্যি চেয়েছি নাকি?'

গোপিকানাথ বললে, 'তুইও যেন কেমন হয়ে গেলি রাণী। কোথায়

একটু সোহাগ জানাবি তা নয়, আর আনতে কুড়। কাছে আয়।’ ছু’হাত বাড়িয়ে দিল গোপিকানাথ। রাণীকে টেনে নিলে বুকের কাছে।

চিরদিনই কি এক অদম্য পিপাসা নিয়ে যেন গোপিকানাথ বুকে টেনে নিয়েছে রাণীকে। ভালবেসে তার সাধ মিটত না যেন। কিন্তু সেদিন বুকে টেনে নেবার মধ্যে আরো কিছু ছিল। রাণীকে নিয়ে বসল সে খাটের ওপর। জানালা দিয়ে দেখা যায় গঙ্গা, বাজার, বাজারের নৌকার ভিড়। কোলাহলও শোনা যায়।

গোপিকানাথ বললে, ‘রাণী, তোকে বড় দুঃসময়ে পেয়েছিলুম। সেদিন তোকে না পেলে, হয়তো নিজে মরতুম, কিংবা আরও দু’জন মরত। তোকেও সখের বশেই টেনেছিলুম প্রথম। কিন্তু তোর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বড় মায়া লাগল। তুই তোর জীবনের কথা বললি। কষ্ট হল প্রাণে। তোর এত কষ্ট রাণী, তবু তোকে দশজনে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু, যার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত সোনায় মোড়া, টাকা জমি বাড়ির যার অভাব নেই, যোয়ান স্বামী যার ঘরে, যে স্বামী বউ অন্তপ্রাণ, যে বউয়ের রূপের পায়ে স্বামী নিজেকে সঁপে দিয়েছে, সে বউও স্বামীকে ঠকায়। কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও। ঠকায় শুধু নয়, পরের সন্তান নিজের গর্ভে ধরেও স্বামীর বলে চালায়। তবু সে বউ হাসে, সাজে, গায়ে পড়ে।’

রাণী অর্থময় চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কার কথা বলছ গো?’

গোপিকানাথ বলল, ‘বুঝতে পেরেছিস রাণী, তোর চোখ বলছে, আমার মুখ দিয়ে আর বলাসনি। যেদিন জানতে পারলুম, সেইদিন সেই বউ আর তার ছেলেকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা করিনি। দশ বছর ধরে যে কথা বিশ্বাস করিনি, তাই প্রমাণ হয়ে গেল।’

রাণীকে আরো কাছে টেনে বলল, ‘নিজের বড় বেঁচে থাকবার সাধ ছিল রাণী। নিজের প্রাণের এত মায়া ছিল। অপরকেও মারতে পারিনি। মনে মনে শুধু আমাদের গৃহদেবতা জনার্দনকে ডেকেছি। সেই সময় তোকে না পেলে কি করতুম জানিনে। আর তোকে বলছি স্বয়ং জনার্দন যেন আমাকে হাত ধরে তোর কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি ওদের পথের ভিখিরি করে দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু, তা আমি দেব না। আমার যে কোন দুঃখু নেই। তোর অনেক রূপ রাণী, কিন্তু সে বউয়ের রূপ তোর চেয়ে কিছু কম নয়। বেশি। তবু রাণী তোর কাছে আমার অনেক দেনা। তোর উড়ে যাবার পাখ্না ছিল যেখানে খুশি, তুই গেলিনে আমাকে ছেড়ে। যার পাখ্না ছিল না, সে বুকে হেঁটে সাপের মত ছোবলাল আমাকে। বাজারটা তোকে দিয়ে আমি কিছুই অন্যায় করিনি। কিন্তু শোন্, এসব কথা কাউকে কোনদিন বলিসনে। এই আট বছর তোকে আমি কিছুই বলিনি, আজ বললুম।'

তারপর চিৎকার করে চাকরকে ডাকলে গোপিকানাথ। বললে, 'কানাই সারেঙ্গী আর নয়ন তবলচিকে ডেকে নিয়ে আয়।'

রাণী বলল, 'কি হবে?'

গোপিকানাথ বলল, 'একটু নাচ্ আজকে রাণী।'

বাজিয়েরা এল। রাণীকে নাচ শিখিয়েছিল গোপিকানাথ কলকাতার বেনারসী নাচওয়ালাকে দিয়ে।

রাণী নাচল। তার কুঁচি দিয়ে অনেখানি ঘের রেশমী শাড়ি ফুলে উঠে ঘূর্ণি খেল। ঝুমুরে তাল বাজতে লাগল যেন, রাণীর বাজার, রাণীর বাজার।

এই কি তবে রাণীর বাজারের বৃত্তান্ত। গোপিকানাথের রাণীর কাছে এলেই কি রাণীর বাজার নামের আদি ইতিহাস দুলতে থাকে এক অস্পষ্ট রহস্যে?

মতদ্বৈধ আছে। থাকবেই। তার আগে যে নাম ছিল রাণী পাড়া? হয় তো তারও পরে বেরুবে, শুনবে কিছু। রাণীর বাজার নামের তাই অন্ত যদিও বা থেকে থাকে ভবিষ্যতের গর্ভে, আদি তার কোনকালে নেই। গোপিকানাথের রাণী কিংবা কোন এক রাণী থেকে রাণীর বাজার। শুধু গোপিকানাথের রাণীর দাবি মুছে দেওয়া গেল না। আজও যায়নি।

কিন্তু বাজারের ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। গোপিকানাথের মুখ কঠিন আর চিন্তিত হয়ে উঠল। গোপিকানাথ বাড়ি যাওয়া বন্ধ করলে।

তার আঠারো বছরের ছেলে গোপালকে দেখা গেল কিছুদিন বাজারের ও রাণীর বাড়ির কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে।

কয়েকদিন পরে, গোপিকানাথ বাড়ি গেল। যেদিন গেল, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা গোপিকানাথের থ্যাঁতলানো মৃতদেহটা কে বা কারা ফেলে রেখে গেল রাণীর দোরগোড়ায়।

সেই দৃশ্যটা আজও ভুলতে পারেনি সৌরভী তার এই বিরানব্বুই বছরে, ঘাটের পথে পা বাড়িয়ে।

লোকজন এল, পুলিস দারোগা এল ওপার থেকে। তখন এখানে ছিল শুধু একজন রাইটার আর জনকয়েক সেপাই। সরকারি অফিস আদালত ছিল গঙ্গার ওপারেই। সেই বুঝি রাণী একটি পুরুষের মৃতদেহের ওপর পড়ে বৈধব্যের কান্না কেঁদেছিল।

শুধু গোপিকানাথের গলার সোনার হারটি ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তার বাড়ির সদর দেউড়ির কাছেই। তারই কোঁচার কাপড়ে, যেটা দিয়ে তার গলায় ফাঁস দিয়েছিল, সেই কোঁচার একটি অংশ খুব জোরে টানাটানি করার জন্যই বোধ হয় ছিঁড়ে পড়েছিল পথের ওপর।

প্রকাশ্যে না হলেও, একথা গোপন থাকল না, মাত্র আঠারো বছরের ছেলে গোপাল তার বাপকে খুন করেছে। কারণ, রাণীর বাজার।

রাণী আরো দেখতে পেয়েছিল তার দূরদৃষ্টি দিয়ে, গোপিকানাথের বিধবা তার ছেলের সঙ্গে বসে যুক্তি পরামর্শ করছে, কেমন করে রাণীকে সরানো যায়।

রাণীর পক্ষে ছিল বাজারের লোকেরা। গোপালের প্রতি তারা বরাবরই রুষ্ট ছিল। বাজারের কয়েকটি বাঘা বাঘা মরদ তাদের রঙ্গিণী মনিবানের ঘর পাহারা দিলে। শুধু তাই নয়, পুলিস যখন রাণীর ওপর খুনের দায় চাপাবার চেষ্টা করলে, তারা সবাই রাণীর হয়ে সাক্ষী দিলে। গোপাল যে মুঠো মুঠো টাকা খাইয়েছে পুলিসকে, সেটাও গোপন ছিল না। গোপিকানাথের বিধবা পুলিস সাহেবকে দু'দিন বাড়িতে রেখে যত্ন করেছে, রাণীর বাজারে সেকথাও আলোচনা হয়েছে।

এ বিষয়ে আর একটি লোক কলকাঠি নাড়ছিল রাণীর জন্মেই। সে মোহন চাটুয্যে। লেখাপড়ার রেওয়াজটা ছিল চাটুয্যেদের, শুধু জমিদারি নয়। পুলিস যখন বুঝলে, অধিকাংশ লোকই রাণীর পক্ষে, তখন তাকে, গোপিকানাথের খুনীকে অনাবিষ্কৃত রাখতে হল। মামলা খতম।

মোহন চাটুয্যে এল রাণীর কাছে। প্রতিদানের প্রত্যাশা তার ছিল। রাণী বিমুখ করেনি।

জীবনে গোপিকানাথের অভাব পূরণ হবে না বটে, কিন্তু একজন লোক দরকার। সাহস দরকাব।

অনেকেই চেয়েছিল রাণীকে। কেন না, শুধু যৌবনের জোয়ারে ভাঁটা পড়েনি বলে নয়, রাণী তখন সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে এক বিচিত্রময়ী নায়িকা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ষড়যন্ত্র চলছিল অন্যদিক দিয়ে। বাজার কেড়ে নেবার নানান ফন্দিফিকির চলছিল। এমন কি গোপালও রাণীর কাছে নত হতে চাইলে।

কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত লোকের এঁটো পরিষ্কার করতেও নাকি রাণীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু গোপালকে সে কোনদিন ক্ষমা করেনি। তার চেয়েও রাণীর বেশি ঘৃণা ছিল গোপালের পশুপ্রবৃত্তিকে যে আড়াল থেকে পরিচালনা করছিল, সেই গোপিকানাথের বিধবার প্রতি।

তারপর রাণীর কাল ফুরলো। সৌরভীর অভিষেক হল রাণীর বাজারের রাণীর স্থানে।

রাণীর বাজারের আর এক পাশের গ্রাম চণ্ডীপুর। সেখানে অনেক আগে থেকেই চটকল আর তেলকল তৈরি হয়েছিল। ক্রমেই লোকজন বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল রেল লাইন।

পাড়ায় পাড়ায় উপপত্নীদের বাড়িগুলি ক্রমেই পাড়া হয়ে ছড়াতে লাগল।

মায়ের সম্পত্তি বাড়িয়ে চলল সৌরভী।

আজকের মত পথে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না। মায়ের চেয়েও

বেশি জমে উঠল সৌরভীর হাট। ইংরেজী বুক্‌নিওয়ালা বাবুরাও এল তার দরজায়। কিন্তু বরাবরই, কারুর না কারুর রক্ষিতা হয়েই কেটেছে সৌরভীবালার। সেই সব পুরুষদের কাহিনী রাণীর বাজারের ইতিহাসে স্থান পাবে, আর লেখা আছে সৌরভীরই গায়ে। শুধু আর যাওয়া-আসার মেয়ে রইল না সৌরভী, ছেলেমেয়ে নিয়ে, ভরা ঘর সংসারেই তার চিরসধবার বেসাতি চলেছে।

শুধু বাজার নিয়ে গণ্ডগোলটা চিরদিন জ্বালিয়েছে সৌরভীকে। গোপাল তাকেও রক্ষিতা করতে চেয়েছে। সৌরভী শুধু জবাব দিয়েছে, 'গোপিকানাথ আমার পিতৃতুল্য, কুলটা হলেও ভাইয়ের সঙ্গে বাস করতে পারব না।'

গোপাল বলেছে, 'ভাই যদি, তবে ভাইকে তুমি বাজারটা দিয়ে দাও।'

সৌরভী বলেছে 'কুকুরের নামে বাজার লিখে দেব, তবু তোমাকে নয়।'

গোপালের ছদ্মবেশী অনুচরেরা এসেছে সৌরভীর কাছে। প্রেম করেছে। অজস্র টাকা দিতে চেয়েছে বাজারের জন্য। কিন্তু, গোপালের দেওয়া তার বাপের টাকায় শুধু তারা ফুর্তি করেই প্রতিদান দিয়েছে গোপালকে।

কিন্তু গোপিকানাথ একটি কথা ভুল বলেছিল। গঙ্গা নদীর বন্যার ভাঙনে নয়, রাণীর বাজার ঢলে পড়ল নতুন কালের নদীর বন্যায়। সেও বন্য, ভংয়কর। যেখানে দিয়ে যায়, সেখানকার সবই সে বদলে দিয়ে যায়।

রাণীর বাজারের নতুন সদর দেউড়ি হল স্টেশন। লাইন বাড়ছিলই। মালগাড়িতে করে মাল চালান আসতে লাগল। আর সুযোগ বুঝে, স্টেশনের সামনেই, রাণীর বাড়ির কাছাকাছি অধর গাঙ্গুলী তার কয়েক কাঠা জায়গায় বিনা 'তোলা'র মিনিমাগনা বাজার খুলে দিল।

সে আর এক কাহিনী। সেখানে আর কোন দেহপোজীবিণীর যোগাযোগ নেই। পারিবারিক সুড়ং-এর মধ্যে নতুন বাজারের ইতিবৃত্ত

আছে লুকিয়ে।

শুধু গোপাল একবার টক্কর দিতে চেয়েছিল অধর গাঙ্গুলীকে। পারেনি। গোপাল ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে বোকা বনে গিয়েছিল। যে বাজার করার বুদ্ধি প্রথম তার মাথায় আসা উচিত ছিল। সেটা গিয়ে খোঁচালে কিনা ব্রাহ্মণের মগজে।

চটকল কোম্পানী এল। রাণীর বাজারটা শুদ্ধু পাশের গ্রামটা পর্যন্ত কিনে নিল তারা। অধর গাঙ্গুলীর বাজার উঠল মাথা চাড়া দিয়ে।

রাণীর বাজারে এল আরো মেয়েমানুষ। বাস্তু পুরোহিতের ভিটেয় ছিল চাটুজ্জ্যেদের উপপত্নীর বাড়ি। সে নতুন লাইন তুলে দিল গণিকাদের।

আজ সেই সৌরভীবালার নাত্‌নি, শিবানী। অনেকদূর, অনেকদূর এসে পৌঁছেছে সৌরভী। রাণীর ঐতিহ্য নষ্ট হয়নি তার ঘর থেকে।

শিবানী সেই আগন্তুকা রাণী, রাণীর বাজারের ইতিহাস ইতিমধ্যেই যার প্রীতি দৃষ্টিপাত করেছে।

কিন্তু মরণ, মরণ এখনো আসে না কেন?

সৌরভী দেখল, জানালায় মুখ বাড়ানো আকাশটায় দিনের আলো হাসছে। মরণ তার আজো হল না।

তবু আমার কালের রাখাল থামল না। রাজার আজ কোথাও যাবার নাম নেই। সকালবেলা স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে বাজিয়ে চলল।

শুধু আমি এইটুকু কাল রাত্রে দেখেছিলাম আমার চিলেকোঠা থেকে ছেউটি রাজাকে বলছে, 'যদি আমার কাছেই না থাক, তবে আর আসা-আসি কেন?'

রাজা হেসেছে।

রাণীর বাজারে অনেক দেখছি, কিন্তু একজনের কথা বলতে গেলে আমার দিন ফুরিয়ে যায়।

আমার এতদিনের দেখা রাণীর বাজারের, আজকের দিনটিকে তুলসী অক্ষয় করে রাখলে চিরদিনের জন্য।

রাত পোহাতে নকড়ি এল। পদশব্দেই বুঝতে পারল তুলসী, কে এসেছে। যদিও তার ভ্রূ কুঁচকে যাওয়ার কথা এই চিরশত্রুর আগমনে, কিন্তু জীবনের অদৃশ্য চিত্রকর তার সুন্দর মুখে, অনুরাগ ও খুশির এক উজ্জ্বল রংয়ের প্রলেপ টেনে দেয় শুধু।

পায়ের শব্দ বাজে না এ বাড়িতে। জগদীশ নিঃশব্দ পদসঞ্চারী। তার চেহারার মত তার চলা। অপলক চোখে, একটু ঝুঁকে, নিশ্চুপ মার্জারের মত তার চলাফেরা। যখন সে গর্তে থাকে, তখন তুলসী টের পায়, দুটি চোখ নিয়ত আছে তার গায়ে গায়ে, পায়ে পায়ে। কখনো অক্ষম লালসায়, কখনো তীব্র সন্দেহে। অতি ধীর তার গতি। অতি আস্তে, স্বভাব-অপরাধীর মত তার গলার স্বর। জগদীশকে টের পাওয়া যায় না। ন্যায়তীর্থ তো যেখানে বসেন, সেখান থেকে আর ওঠেন না। তুলসীর পায়ে শাস্ত্রানুশাসন, নিঃশব্দগতি মার্জারী হওয়াই তার বিধেয়।

একমাত্র ন'কড়ি এলেই এ বাড়ির ভিৎসুদ্ধ কাঁপে। তুলসীর বুকের কাঁপুনিটা তো দম দেওয়া কলের পুতুলের মত। সেই যে কবে কোন্ বিধাতা চাবি ঘুরিয়ে দিলে, আর তা থামেনি।

তুলসী উৎকর্ণ হয়ে রইল। যদিও, কালেভদ্রেই নকড়ি ন্যায়তীর্থের ঘরে ঢোকবার আগে, তুলসীর ঘরে উঁকি দিয়ে থাকে, তবু তুলসীর আশা মরে না। মরে না তাই, বড় আয়নাটার দিকে চোরা চোখে চেয়ে থাকে তুলসী। নিজেকেও দেখে নেওয়া হয়, নকড়ির ছায়াটাও চোখে পড়তে পারে।

ন'কড়ি সোজা ন্যায়তীর্থের ঘরেই গেল।

ন্যায়তীর্থ হাঁটুর ওপর মাথা নুইয়ে বসেছিলেন। সুদীর্ঘ কুঞ্চিত চামড়া হাত দুখানি লুটিয়ে আছে মাটির ওপর। কোমরের কাছে এক চিলতে ন্যাকড়া। যেন জীবনের ভারে ন্যুব্জ ভারবাহী একটি জীব। জরা যার দেহ থেকে মানুষিক রূপকে অপহরণ করে নিয়েছে একটু একটু করে।

ন'কড়ি ডাকল, 'দাদু।'

ন্যায়তীর্থ মাথা তুললেন। ন'কড়ির গলার স্বর শুনলেই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। বললেন, 'নকু?'

'হ্যাঁ।'

'কোন দুঃসংবাদ—' ন্যায়তীর্থের ভ্রূর চামড়া যেন গলে গলে পড়তে থাকে ত্রাসে।

ন'কড়ি হেসে বলল, 'সে সব কিছু নয় দাদু। সংবাদ সবই ভাল, কোন গণ্ডগোল নেই। আপনাকে একটা সই করতে হবে।'

'সই?' ন্যায়তীর্থের মুখে অসহায় বিস্ময়।

ন'কড়ি বলে, 'হ্যাঁ ভয় পাবার কিছু নেই। এটাও একটা দলিল বটে। তবে, জমিজমা টাকাপয়সা সংক্রান্ত নয়।'

'তবে?'

ন'কড়ি বলল, 'আমরা দেখাতে চাই দাদু, দেশের লোকে যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। যে চায় না, আমরা তার সই নিচ্ছি। আপনি যুদ্ধ চান না শান্তি চান?'

ন্যায়তীর্থ একটু সোজা হয়ে বসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'কাদের সঙ্গে যুদ্ধ? তোমাদের এই পাকিস্তান না কি, তাদের সঙ্গে?'

'যাদের সঙ্গেই হোক, দেশে যুদ্ধ হবে কি না, আপনি কি চান?'

ন্যায়তীর্থের রেখাকবলিত মুখে হাসি দেখা দিল। বললেন, 'তোমাদের সেই দলের কাজ বুঝি? কোথায় পাঠানো হবে সইগুলো?'

ন'কড়ি বলল, 'সব দেশের প্রতিনিধিরা যেখানে মিলিত হয়, সেই রাষ্ট্রসংঘে।'

'কিন্তু ভাই, আমরা তো খরচের খাতায় পড়ে গিয়েছি, আমাদের চাওয়া না চাওয়ায় কি হবে?'

'কিন্তু জমার খাতায় যে আমাদের এনেছেন? আমরা তো আছি এখনো।'

ন্যায়তীর্থ চুপ করে রইলেন। ছানি পড়া চোখ দুটি তুলে ধরলেন। যেন কিছু দেখতে চান। তারপরে ডাকলেন, 'নকু, কাছে এস।' ন'কড়ি

কাছে এল। ন্যায়তীর্থ তার গায়ে হাত দিলেন। বললেন, 'কোন্ যুদ্ধটার কথা বলছ? আমাদের, না তোমাদের সময়ের?'

'আমাদের, আপনাদের, সব সময়েরই দাছ।'

'আমাদের সময়েরটা তুমি দেখনি। তখন তোমার জন্ম হয়নি। তখন হিন্দুর অ-বধ্য গাভী শাবক মেরে, সনাতন ভট্টাচার্য লক্ষ টাকা রোজগার করেছিল। সে টাকায় সে মন্দির করেছিল, তোমরা জান না। রায়বাহাছুর খেতাব পেয়েছে সে। আর চিকনপুরে, আমার বৃদ্ধা শাশুড়ি অনাহারে মারা গিয়েছিলেন। চালের দর হয়েছিল দশ টাকা মন। আমরা সময়মত খবর পাইনি। খবর পেলে অনাহারে মরতে হত না। সেকথা থাক। তখনো মানুষের ভাগ্যের বিধান কিছুটা ভগবানের হাতে ছিল ভাই। তোমাদের সময়ের যুদ্ধটা সেটাও বদলে দিয়েছে। ভগবানেরই ভাগ্যটা অপরেরা পেয়েছে নিজের হাতে, নয় কি?'

এরকম প্রশ্নের মুখে পড়ে ন'কড়ি অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। কি জবাব দেবে, ভেবে পেল না।

ন্যায়তীর্থ বললেন, 'না না, তুমি অন্যরকম মনে করো না ভাই। পুরাণের নজীর দিচ্ছি তোমাকে আমি। দেবতাদেরও অসুরের হাতে বন্দী হতে হয়েছে, নয় কি?'

'বইয়ে পড়েছি দাছ।'

'আজ চাক্ষুষ দেখছ। অসুরের হাতে ভগবানেরা মরছে, অ্যাঁ, কি বল? তুমি তো আমাকে সেই যুদ্ধের কথা বলছ, যখন তোমার মা তোমাকে ছুবেলা ছুটি খেতে দিতে পারেননি, একটু কেরোসিন তেল দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দিতে পারেননি তোমার কলেজের পড়া করবার জন্যে?'

ন'কড়ি দাছুর শত ভাঁজ মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ দাছু।'

'বুঝেছি। তুমি সেই যুদ্ধটার কথা বলছ, যখন আমাদের প্রহ্লাদ হালদারের বউটি গলায় দড়ি দিল ন্যাংটো হওয়ার ভয়ে, আর মেয়েটি পালিয়ে গেল। কেমন তো? সাহেব সেপাইরা যখন আমাদের শিব মন্দিরে ঝি কমলার মেয়েটাকে মেরে রেখে গেল সর্বনাশ করে, আর

আমাদের পাঁচগুলি পরগণার সাত হাজার লোক না খেয়ে মরল যে যুদ্ধে, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'দাও, কাগজ দাও, কলম দাও। আমার বাঁ হাতের তর্জনী বসিয়ে দাও নিবের ডগায়, আর নিবটা ঠেকিয়ে দাও সইয়ের জায়গায়।'

'পারবেন সই করতে?'

আর কথা বলতে পারলেন না ন্যায়তীর্থ, হাঁপাচ্ছেন এখন। কাঁপছেন থর্ থর্ করে। বললেন, 'পারব। কিন্তু সংস্কৃতে সই করব ভাই। বলছ যখন এটা বাইরে যাবে। শত হলেও আমাদের প্রাচীন বংশ, দেবভাষায় শাস্ত্রচর্চা করেছি, তাই—'

'তাই করুন আপনি।'

নৈয়ায়িক সই করলেন, চণ্ডীচরণ ন্যায়তীর্থ।

অক্ষরগুলি হল আঁকা বাঁকা, কাঁপা কাঁপা, দুর্বোধ্যপ্রায়। অর্ধ-চন্দ্রাকার লাইন। সই করে ন্যায়তীর্থ বললেন, 'হে নারায়ণ, হে ঈশ্বর!'

ন'কড়ি বলল, 'এবার চলি।'

ন্যায়তীর্থ ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে এলিয়ে পড়েছিলেন। বললেন, 'আর কোন কথাই আজ হল না নকু। দল করিস, যাই করিস, তোর মায়ের মনে কষ্ট দিসনে। তোর মাকে আসতে বলিস। তুলসীকে একবার পাঠিয়ে দিস।'

নকড়ি চলে গেল।

বাইরে এসে, দোতলার দালান পেরিয়ে, সিঁড়ির কাছে এসে দেখল তুলসী গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নকড়ি বলল, 'এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে যে?'

তুলসী মুখ না তুলেই বলল, 'কোথায় আর যাই তবে? তোমাদের বন্ধ ঘরের দাদু-নাতির কথায় তাহলে আড়ি পাততে হয়।'

ন'কড়ি হেসে বলল, 'দরজা তো আজ বন্ধ ছিল না।'

সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলল তুলসী, 'তাই নাকি? তা হলে নতুন ব্যাপার বলতে হবে।'

তুলসীর গায়ে জামা নেই। থাকত না বড় একটা শীতকালটুকু ছাড়া। তার সূর্যচ্ছটা উন্মুক্ত পিঠে প্রায় পিঙ্গল খোলা চুল এলিয়ে পড়ে আছে ; জগদীশ নয়, ন্যায়তীর্থ নয়, একমাত্র ন'কড়িকে দেখলেই যেমন-তেমন করে একটুখানি ঘোমটা টানার চেষ্টা করে সে। সেইরকম চেষ্টাকৃতভাবেই, বুকের কাপড়ই ঘাড়ের পাশ দিয়ে টেনে এনে মাথায় একটু ঠেকিয়ে রেখেছে। কপালে তো নয়ই, সিঁথির সামান্য সিঁদুর চিহ্নও যেন অস্পষ্ট।

ন'কড়ি বলল, 'সকাল তো আটটা সবে, এখন থেকেই যদি সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে অপেক্ষা কর, দিন যে কাটবে না।'

প্রথমটা তুলসী বুলতে পারেনি। ভ্রূ কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অপেক্ষা ? কার অপেক্ষা ?'

নকড়ি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'জগদীশদার।'

সহসা একটি তীব্র হাসিই বুঝি সশব্দে উপ্‌চে আসছিল তুলসীর ঠোঁটে। কিন্তু হাসিটা এল না। বলল, 'বোঝ তো সবই। কি আর বলব।'

ন'কড়ি কি হাসছে ? বলল, 'সব বুঝি, সে কথা কেমন করে বলি বউদি।'

তুলসী চোখ নামাল না। নামাতে পারল না। ন'কড়ির চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'সত্যি বোঝ না ?'

এই চিলেকোঠা থেকে, আমারই মত ন'কড়িও যেন দেখল, তুলসীর সূর্যচ্ছটা বঙ্কিম দেহে, বিম্বোষ্ঠে, বিশাল চোখে, প্রলয়ের বাসনা দপ্‌দপ্‌ করছে। একটু যেন অন্যমনস্কের মত তুলসীর দিকে তাকিয়ে, মাথা নাড়ল ন'কড়ি, 'না।'

'বুঝতে চাও না বোধ হয় ?'

হঠাৎ যেন বলিষ্ঠ ন'কড়িকেও কেমন অসহায় মনে হয়। হেসেই বলল, 'কোন বোঝাবুঝির কথা বলছ, সেটা একটু বুঝিয়ে বল তাহলে।'

আমারই বুকের মধ্যেটা বুঝি শুধু কাঁপছিল এই চিলেকোঠায়। দেখলাম, তুলসী তার স্খলিত আঁচল গোছাল না। দেখলাম, ন'কড়ির

কাছে নিজেকে আড়াল করে রাখার সব আবরণগুলি যেন খসে পড়ছে। দ্বিচারিণী নয়, শাস্ত্রের দাবী অনুযায়ী নারীর সব কারুকলা তার দেহের দৃষ্টি দগ্ধ-চ্ছটায়। কোন চারণই যার হয়নি, দ্বিচারিণী সে হয় কেমন করে ?

তুলসী বলল, 'সেটাও বুঝিয়ে দিতে হবে ?'

'নইলে ?'

'একেবারে বেহায়া চেহারাটা দেখতে চাও।'

'এবার ন'কড়ি হেসে উঠল। বলল, কেটে পড়ি বউদি।'

'না।'

'না নয়, তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে, পায়ের তলাটা কাঁপে।'

'আমারও পায়ের তলা কাঁপে।'

ন কড়ি জোরে হেসে বলল, 'দুজনেই পড়ে মরব শেষটায়।'

তুলসীর ঠোঁটেও কথার অভাব নেই, 'ধরাধরি করে থাকব।'

ততক্ষণে ন'কড়ি সিঁড়ির মাঝামাঝি নেমে গিয়েছে। নামতে নামতেই বলল, 'তার চেয়ে, পা দুটোকে শক্ত সোজা করা যাক বউদি, কষ্টটা কম হবে। তুমি দাদুর কাছে যাও।'

অদৃশ্য হয়ে গেল ন'কড়ি। তুলসীর রক্তাভ ঠোঁটে তার দাঁত চেপে ধরল। সিঁড়ির রেলিং ধরা শক্ত মুঠি তার যেন কাঁপছে, অবশ হয়ে আসছে। দাঁতগুলিও যেন ঠক্‌ঠক্ করছে. দারুণ শীতে চেপে বসবে হয়তো। বুকের মধ্যে শুধু কয়েকটা কথা বাজছে ঃ ছলনা, শুধু ছলনা। মিথ্যুক, মিথ্যুক।

ন্যায়তীর্থের চিৎকার ভেসে আসছে, 'নাতবউ! ওরে নাতবউ! জগুর বউ তুলসী, তুলসী।'

এই নীচু চাপা বাড়িটায়, প্রতিধ্বনির কোন আশা নেই। নৈয়ায়িকের কণ্ঠস্বর বাইরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু ন্যায়তীর্থ কখনও থামেন না। একবার ডাকতে শুরু করলে, ছেলেমানুষের মত ঘ্যানরঘ্যানর করতেই থাকেন। এ যে শুধুই খিদের কান্না, তা নয়। মানুষের সঙ্গ চান। একলা কতক্ষণ থাকবেন ?

তারপর একটু একটু করে দেহের অবসন্নতা কাটে তুলসীর। ক্রোধ ও ঘৃণা তাকে গ্রাস করতে থাকে। নৈয়ায়িকের চিৎকার বাড়তে বাড়তে ঘরে ছুটে গেল তুলসী। আতপ চালের হাঁড়িটা নিয়ে, ন্যায়তীর্থের মাথায় সে ঢেলে দিল সব চাল।

ন্যায়তীর্থ বললেন, 'কি? কি এসব?'

তুলসীর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। বলল, 'এখনো সেদ্ধ হয়নি, ওই দিলুম, খান।'

আমি দেখলাম, যিনি একটু আগে শান্তিপত্রে সই করেছেন তিনি তুলসীকে না পেয়ে মূত্রত্যাগ করেছেন ওখানে বসেই।

বললেন, 'চাল না? তাইতো, চাল খাব কি করে?'

তুলসী চিৎকার করে বলল, 'তবে চেঁচাচ্ছেন কেন? যম এসেছে আপনাকে নিতে?'

'হে ঈশ্বর!'

ঠোঁট কুঁচকে বলল তুলসী, 'ঈশ্বর দেখছেন, না! নাতিকে বললেন না কেন সব করে দিয়ে যেতে?'

বলে তুলসী নৈয়ায়িককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও প্রস্রাবের মধ্যে মাখামাখি দেখে, হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'এসব কি করেছেন, অ্যাঁ?'

ধাক্কার জোরটা বুঝি তুলসীও বুঝতে পারেনি। নৈয়ায়িক মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। একটি শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ!'

তবু তুলসী দজ্জাল ছেলেকে শাসন করার মত, দু'হাতে নৈয়ায়িককে বুকে তুলে, দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে দিলে। ভেজা ন্যাকড়াটা খুলে নিয়ে, নতুন শুকনো ন্যাকড়া চণ্ডীচরণকে পরিয়ে, ঘর মুছতে মুছতে বলল, 'কেন আমি এসব করব? কেন বলতে পারেন? একটা ছ্যাকরা গাড়ি সঙ্গে তো জুড়ে দিয়েছেন, নিজেও ফাঁকি মারছেন আমাকে। লজ্জা করে না আপনার। এই বুড়ো বয়সে—'

সভয়ে থেমে গেল তুলসী। সে দেখল, দেয়ালে হেলান দেওয়া ন্যায়তীর্থ ক্রমেই আরো ঝুঁকে পড়ে যেন এগিয়ে আসছেন তার দিকে।

মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে তাঁর একটা হাতও এগিয়ে আসছে তুলসীর পায়ের কাছে। কিন্তু মাথাটা ঝুলে গিয়েছে তাঁর, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

তুলসীর মনে হল, হঠাৎ একটা অশরীরী সত্তা যেন, প্রবেশ করছে ঘরে। সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'এ কি করছেন?'

কোথায় একটা মট্ করে শব্দ হল। নিজের হাতের ওপরেই ন্যায়তীর্থের দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ন্যায়তীর্থকে তাড়াতাড়ি ধরে চিৎ করল তুলসী।

নৈয়ায়িক চণ্ডীচরণ মারা গেলেন।

রাণীর বাজারের ইতিহাসের এক নায়কের আমি এই বিচিত্র মরণ দেখলাম। পুণ্যের প্রাচীন পাণ্ডিত্যের দৈহিক অবসান।

সৌরভীবালা পড়ে আছে এখনো জীবিত।

ন্যায়তীর্থ বুঝি তাই এই মুক্তির কৃতজ্ঞতায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে তুলসীর পায়ের দিকে।

তবু আমার হৃৎপিণ্ডে সহসা কঠিন শিলাপাতে স্তব্ধ হয়েছিলাম। আমার বুক থেকে একটি শব্দও বেরুতে পারল না মুখ দিয়ে। আমার কানে বাজছিল, হে ঈশ্বর, হে নারায়ণ, পরমেশ্বর মুক্তি দাও। মুক্তি দাও!

তুলসী অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। কি করে, কখন, কোন্ মুহূর্তে মারা গেলেন দাদাশ্বশুর?

মৃতদেহ! যাঁর কাছে তুলসীর কোন প্রাপ্তির আশাই মেটেনি।

সেই প্রথম ধাক্কার আঘাতেই এখনো ন্যায়তীর্থের ঠোঁটের কষে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। রক্ত ছিল শেষ মুহূর্তেও!

জরা ও বার্ধক্যের মৃত স্খলিত দেহপিণ্ডের পাশে, বাসনার মোহিনী-মূর্তি বিস্রস্ত বিস্মিত ভীত তুলসীকে, মৃত্যুপুরীর অভিশপ্ত আত্মা বলে মনে হল। সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমি মারলুম আপনাকে?'

তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে নৈয়ায়িকের ঠোঁটের রক্ত মুছে তুলসী উঠে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তবু একটা ব্যর্থ আশার জীবিত জ্বালা শেষ হয়েছে তার। চোখে তার জল আসুক, শোক

করবে না তুলসী।

সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের জানালা খুলে চিৎকার করে ডাকল, 'ন'দি ন'দি।'

শরিকানা ভাগের, পাশের একটি ছোট জানালায় এক প্রৌঢ়ার মুখ ভেসে উঠল।

তুলসী বলল, 'ঠাকুর্দা মারা গেলেন এখুনি, একেবারে হঠাৎ। সবাইকে খবর দিন। ন'কু ঠাকুরপো এই যাচ্ছে। কাউকে পাঠান।'

মুহূর্তে গোটাবাড়ির বউ-ঝিয়েরা সব এল।

যাদের না কাঁদলেই নয়, তারা কাঁদল। যদিও তারা জানত না ন্যায়তীর্থ বলে কোন ব্যক্তি আজও এই বাড়ির কোন ঘরে সত্যি জীবিত আছেন।

তুলসী সবাইকে বলল, 'এইতো ন'কু ঠাকুরপো যাচ্ছে ওঁর কাছ থেকে। তারপরে আমি নোংরা পরিষ্কার করছি, হঠাৎ বসে থেকে পড়ে গেলেন।'

জগদীশকেও খবর দেওয়া হয়েছিল কারখানায়। প্রায় আট দশ বছর বাদে সে ন্যায়তীর্থের ঘরে ঢুকল নিঃশব্দে।

ন'কড়ি এল। ন্যায়তীর্থের কাছে যাবার আগেই, তুলসীর সঙ্গে চোখাচোখি হল তার।

ন'কড়ি যেন এইটুকু সময়ের মধ্যেই নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এল। তার মুখ কঠিন, গম্ভীর দৃষ্টি, সন্দিগ্ধ। বলল, 'কেমন করে মারা গেলেন?'

তুলসীর যেন কেমন ভয় করতে লাগল ন'কড়ির দিকে চেয়ে। বলল, 'আপনি আপনি পড়ে গেছলেন।'

ন'কড়ি যেন মেঘের স্বরে বলল, 'রাগ করে মারধোর করনি তো?'

তুলসীর মুখ সাদা হয়ে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল যেন সব সুলক্ষণ। বলল, 'কেন?'

'মনের জ্বালায়। তোমাকে উনি সম্পত্তি দেন নি তাই?'

তুলসীও যেন হঠাৎ উজ্জীবিত হয়ে উঠল একটা কঠিন হিংস্রতায়। বলল, 'তা মারধোর করতেও পারি। কি করবে?'

ন'কড়ির চোখেও আগুন। সে আগুন সিংহের। বিনাবাক্যব্যয়ে সে ন্যায়তীর্থের ঘরে গেল। দেখল। গায়ে হাত দিল। ঠোঁটের কষে দাগও দেখল রক্তের। বাঁ হাতের মণিবন্ধের গ্রন্থি ভাঙা, তাও টের পেল।

ন্যায়তীর্থের মেয়ে ন'কড়ির মা এলেন। নৈয়ায়িকের বৃদ্ধ ভায়েরা, ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সবাই জড়ো হল।

রাণীর বাজারের প্রাচীনতম পণ্ডিত, রাণীর বাজারের পুণ্যের ও ধর্মের ইতিহাসের মৃতদেহ শ্মশানযাত্রা করল।

হরিধ্বনি শুনতে পেল সৌরভীবালা—জিজ্ঞেস করল, 'কে?' জবাব দিল কে একজন, 'দ্বিজপাড়ার সেই বুড়ো পণ্ডিত, চণ্ডীচরণ চক্রবর্তী।'

সৌরভীবালা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, 'ক্ষমা কর, হে ঠাকুর, ক্ষমা কর।'

রাত্রি ন'টার সময়, শবযাত্রী ন'কড়ি স্নানশেষে, বাড়ি হয়ে, আবার এল ন্যায়তীর্থের বাড়িতে।

অন্ধকার বাড়ি। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে নকড়ি দালানে এল। কেউ নেই। একটা বাতিও নেই। ঘরেও বাতি নেই।

ন'কড়ি ডাকল, 'মেজদা।' জগদীশকে ডাকল সে। কোন সাড়া শব্দ নেই।

জগদীশ দাঁড়িয়েছিল দালানের শেষ প্রান্তে জানালার কাছে। সে সরে দাঁড়াল নিঃশব্দে। দু'চোখ তার চোখ-খাবলার মত তীব্র হয়ে উঠল। তুলসীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ন'কড়ি ডাকল, 'ঘরে কেউ আছে?'

'আছি।' তুলসীর গলা।

ন'কড়ি বলল, 'বাতি জ্বাল।' গলায় তার নির্দেশের সুর।

তুলসী টের পেয়েছিল পায়ের শব্দে কে আসছে। তবু নীরব ছিল। উঠে বাতি জ্বালল সে।

ঘরে ঢুকল ন'কড়ি। চোখে তার তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল, 'মেজদা কোথায়?'

মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল তুলসী, 'জানিনে।'

ন'কড়ি তুলসীর কাছে গেল। এত কাছে গেল যা কোনদিন যায়নি। তুলসীর ভয় হল। সে ফিরে তাকাল নকড়ির মুখের দিকে ন'কড়ি যেন অর্থহীনভাবে অথচ দৃঢ়স্বরে বলল, 'এতদিন শুধু দাদুর কাছেই আসতুম না, তোমাকেও দেখতে ইচ্ছা করত।'

তুলসী চমকে উঠল। বুঝি তার গায়ের কম্পন নকড়িকে স্পর্শ করবে।

ন'কড়ির দুই চোখে চাপা ব্যথা। বলল, 'তোমার কাছে আসার পথটা চিরদিনের জন্য তুমিই বন্ধ করলে। তোমার জন্য অনেক ভাবনা ভেবেছি, আর না ভাববার চেষ্টা করব।'

তুলসী হাত বাড়াতে গেল ন'কড়ির দিকে। বলল, 'শোন ঠাকুরপো।'

'দাঁড়াও।' বলে নিজেই সরে দাঁড়াল ন'কড়ি।

আমি আমার চিলেকোঠা থেকে দেখলুম, ন্যায়তীর্থও একটি বড় বাজী খেলে গিয়েছেন। তাঁর রংয়ের শেষ টেক্কাটা বার করল ন'কড়ি পকেট থেকে। স্ট্যাম্প পেপারে উইলপত্র।

সেটা তুলসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধর।'

'কি?'

'উইল। তোমাকে দাদু তাঁর স্থাবর-অস্থাবর, রাণীর বাজারের টুকরোটাকরা জমি, এই বাড়ি, পাঁচগুলি পরগণার সব তোমাকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন।'

তুলসী পড়ে যেতে গিয়ে, দু'হাতে ন'কড়িকে ধরল।

ন'কড়ি তাকে দু'হাতে খাটের কাছে সরিয়ে দিল। বলল, 'সব। শুনে নাও। মেজদা সব নষ্ট করে ফেলবে, তাই ভান করেছেন দাদু তার কিছু নেই, সব বিকিয়ে গেছে। তোমাকেও বললে তুমি মেজদাকে বলবে, তাই তোমাকেও বলতে বারণ ছিল।'

তুলসী কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। চোখ তার ফেটে পড়ছে, চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে সে টেরও পায়নি।

ন'কড়ি বলল আবার, 'দাদু বুড়ো হয়েছিলেন, একটু বাতিকগ্রস্ত

হয়ে পড়েছিলেন, তাই দরজা বন্ধ করে সংবাদ নিতেন, তাঁর উইল জমিজমা, পাঁচশুলি পরগণা, সব ঠিক আছে কিনা।'

বলে, উইলখানি ছুঁড়ে দিল ন'কড়ি তুলসীর দিকে। ন'কড়ির চোখেও বুঝি জল, তবু জ্বলছে ধক্ ধক্ করে, 'মানুষ কোথায় নামে, আমি তাই দেখলুম। দাদুর মুখে আমাকে আর কোনদিন শুনতে হবে না যে, তিনি তাঁর নাতবউয়ের সেফ্‌টিপিন ফোটানো টের পেয়েও বিছে কিংবা পিঁপড়ের কামড়ের ভান করে কেঁদেছেন। শুনতে হবে না, স্থায়তীর্থকে ভাতের মাড়—'

তুলসী একটা অমানুষিক চিৎকার করে, ন'কড়ির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'ক্ষমা কর, ওগো ক্ষমা!'

ন'কড়ি নাম ধরে বলল, 'তুলসী, মানুষকে এমনি করে পিশাচ হতে দেখেছি বলেই, সত্যকে খুঁজে মরছি। তোমার উইল আমাদের ঘরে যখন পড়েছে, তখন আমার মা আমাকে এক বেলা খেতে দিয়েছে। ছেড়ে দাও, পা ছেড়ে দাও।'

তুলসীর গায়ে কাপড় নেই। নিজেরই চুলের গোছা তার মুঠি ভর্তি। পবিত্র বাসনার প্রতিমূর্তি, পাগলিনীর মূর্তি ধরেছে। চিৎকার করে বলল, 'না, না, পায়ে পড়ি, যেও না, যে-ও না।'

ন'কড়ি দু'হাতে তুলসীকে সরিয়ে, অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

তুলসী চুল ছিঁড়ে ভয়ংকরী হয়ে উঠল, আর ডাকতে লাগল, 'ঠাকুর্দা, ঠাকুর্দা গো! ঠাকুরপো···ন'কু ঠাকুরপো······।'

অন্ধকারের বুক থেকে জগদীশের মুখ ভেসে উঠল। চোখে তার তীব্র সন্দেহ, অক্ষম লালসা। সেই লালসাসিক্ত চোখ, তুলসীকে পেরিয়ে, উইলপত্রের দিকে পড়ল।

সহসা বাঘিনীর মত চকিত হয়ে উঠল তুলসী। তার কঠিন হাতে চেপে ধরল জগদীশকে।

জগদীশ জোর করল। পারল না। তুলসীর ধাক্কায় বাইরে গিয়ে পড়ল। তুলসী দরজা বন্ধ করে দিল।

জগদীশ দরজায় করাঘাত করতে লাগল। এই নীচু চাপা অন্ধকার

বাড়িটায়, সেই শব্দ একটা শ্বাপদ থাবার আঁচড়ানোর মত শব্দ করতে লাগল।

তুলসী অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

জীবন কি বিচিত্র।

রাণীর বাজার আমাকে অনেক দেখাল। অনেক শুরু বাকি রয়ে গেল। একজনের কথা বলতে গেলে, আমার দিনভোর হয়ে যায়। একজনকে দেখতে গেলে আর একজন বাদ পড়ে যায়। তবু প্রতিদিনের কোনটুকুই বাদ দেব না আমি। ফাঁকি দেব না।

রাণীর বাজারের চিলেকোঠার এই দরজা ধরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যেদিন আমার সব দেখা হবে, সেদিন সকলের জন্য খুলে দেব এই দরজা।

শুধু যার অন্তহীন চোখের জল ভিতরেই শুকিয়ে গেল, বাষ্প হয়ে সুরের ঝংকারে ছড়িয়ে রইল রাণীর বাজারের আকাশে, সে আমার নির্বিকার কালের রাখাল আর তার বাঁশী।